ভে ত রে

মোদীর ... শ্লোগান দুটির পেছনে যে এজেণ্ডা ... ২
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন প্রসঙ্গে ... ৩
সারদা সি বি আই তদন্ত কোন অভিমুখে? ... ৪
পশ্চিমবঙ্গে গৈরিক উত্থান—নতুন এক চ্যালেঞ্জ ... ৫
মহিলারা রাতের শিফটে কাজ করতে পারেন ৬
আন্দোলন ঃ উত্তরপ্রদেশে—দিল্লীতে ... ৭

গণদাবী

₹৩

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১৫০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৮০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২১ সংখ্যা ৩৩ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ১৬ অক্টোবর ২০১৪

বর্ধমান বিস্ফোরণ স্থল পরিদর্শনে সি পি আই (এম এল) প্রতিনিধিদল

বর্ধমানের খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণকাণ্ড কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে সামনে এনেছে। দেখা গেল কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পুলিশ-প্রশাসন-গোয়েন্দা দপ্তর সম্পূর্ণ ব্যর্থ। জেলা পুলিশের সদর দপ্তরের তিন কিলোমিটারের মধ্যে ঘটে যাওয়া এই ঘটনা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বিপন্ন করে তুলেছে। পাশাপাশি চলছে উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচার। গত ৮ অক্টোবর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পার্টির এক প্রতিনিধিদল এ কথা বলেন এবং তারা দাবি তোলেন প্রকৃত তথ্য সামনে আনার লক্ষ্যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য জয়তু দেশমুখ, বর্ধমান জেলা কমিটি সম্পাদক সলিল দত্ত, কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশন সদস্য অমলেন্দু চৌধুরী, বর্ধমান জেলা পার্টি নেতা পরেশ ব্যানার্জী, অন্নদা প্রসাদ ভট্টাচার্য, কুনাল বক্সী। পরিদর্শনের পর তাঁরা জানান, এই বিস্ফোরণের ঘটনাকে পুঁজি করে বিজেপি-আর এস এস জোট উগ্র সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করতে চাইছে। যে কর্পোরেট মিডিয়া বিগত দিনে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিজেপিকে ক্ষমতায় বসাতে উগ্র হিন্দুত্ববাদী প্রচারের ঝড় তুলেছিল তারাই এখন সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টির কাজে ওদের প্রধান সহযোগীর ভূমিকা নিচ্ছে। এমন প্রচার চলছে যেন সমগ্র মুসলিম সমাজই সন্ত্রাসবাদী, আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানানো হচ্ছে সমস্ত খারিজী মাদ্রাসাগুলোকে।

যেমন বিস্ফোরণকাণ্ডের অনতিদূরেই রয়েছে একটি মাদ্রাসা। ঐ মাদ্রাসা এবং বিস্ফোরণ স্থলকে একসাথে চিহ্নিত করে রোড ম্যাপ এঁকে একটা নাশকতার ব্লু প্রিন্টের ছবি তুলে ধরেছে একটি প্রথম সারির বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র। যেন মনে হচ্ছে সন্ত্রাসবাদীরা একাধিক ডেরা বানিয়েছিল এবং ঐ মাদ্রাসাটি যার অন্যতম! কিন্তু পরিদর্শনের সময় পার্শ্ববর্তী মহল্লার সর্বস্তরের মানুষের সাথে কথা বলে জানা গেল ঐ মাদ্রাসাটিতে স্থানীয় কেউ পড়তোই না। বিস্ফোরণকাণ্ড যে বাড়ীতে ঘটেছিল সেখানে ভাড়াটে হিসাবে যারা থাকতো তাদের সাথে স্থানীয় মানুষের কোন চেনা পরিচিতিই ছিল না। যারা পরিচারিকার কাজ করে এমন মহিলারাও জানালেন ঐ বাড়ীতে কাজের লোক নেওয়া হয়নি। বিস্ফোরণের সাথে জড়িত সন্দেহে একটি মাদ্রাসার ছবি ছেপে স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে দেখানো হচ্ছে সেখানে জঙ্গী প্রশিক্ষণের উপযোগী জানালা দরজা নাকি তৈরী করা হয়েছে! নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত একজন পদাধিকারী জানালেন, সন্ত্রাসবাদীদের সাথে যোগাযোগ আছে এমন মাদ্রাসাগুলোকে সরকার চিহ্নিত করুক, এটা না করে একটি সম্প্রদায়ের মানুষের আবেগে আঘাত দেওয়া হচ্ছে কেন? কিন্তু রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের মতো করে প্রতিনিয়ত মিডিয়াতে অর্ধসত্য প্রচার চলছে। নোয়াম চমস্কি যেমন বলেছিলেন, অত্যাধুনিক যুগে মিডিয়া সাধারণত বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত এবং এরা রাষ্ট্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন ইরাক আক্রমণ যে অমার্জনীয় অপরাধ সে সত্য সংবাদ মাধ্যম কখনও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেনি। সরকারের কাছে চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা আরও গুরুত্বপূর্ণ। সর্বজনীন বিষয়ে অজ্ঞ জনতার হস্তক্ষেপ রুখতে কৌশল দরকার ... যেখানে জনগণ হবে দর্শক, অংশগ্রহণকারী নয়, মতবাদের ক্রেতা এবং পণ্য। মিডিয়ার আসল সংকট আয়ের স্বল্পতা নয়, মেধার অসততা ও একদেশদর্শীতা। বর্তমানে মিডিয়ার প্রচারে এই বিষয়গুলোই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

পরিদর্শনকারী দল এলাকায় বিভিন্ন মানুষের সাথে কথা বলে জানতে পারে বিস্ফোরণ ঘটে যে বাড়ীটিতে তার নীচতলায় তৃণমূলের কার্যালয় ছিল। তার পাশে বাড়ীটির মালিকের (যিনি রাস্তার বিপরীতে দোতলা বাড়ীতে থাকেন) ছেলে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ডাক্তারখানা চালাতেন। কিন্তু বাড়ীর মালিক হাসান চৌধুরীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। শাসক তৃণমূলের ঘনিষ্ঠতার জন্যই কি? এ প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। বর্ধমান শহর থেকে দুর্গাপুরগামী জি টি রোডের ধারে তিন কিলোমিটার দূরত্বে ঐ এলাকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, অঞ্চলের নাম সরাইটিকর। পঞ্চায়েত দখল করার পর থেকে বিগত তিন বছরের বেশী সময় ধরে ওখানে তৃণমূলের আধিপত্য রয়েছে। মূলত সংখ্যালঘু মানুষের ঐ পাড়াটিতে চার ঘর হিন্দু। তাদের একজন জানালেন, এখানে আমরা সবাই মিলেমিশেই থাকি। বিস্ফোরণের পর যারা সবার আগে ছুটে গিয়েছিল সেই যুবকদের একজন জানালো, ভেতরে ঢুকতে আমাদের বহুক্ষণ বাধা দেওয়া হয়, পুলিশ আসতে অনেক দেরী করে। ভেতরে যে মহিলারা ছিলেন তারা এর ফলে মজুত কাগজপত্র পুড়িয়ে দিতে অনেক সময় পেয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে শাসক তৃণমূল বিস্ফোরণের ঘটনাটিকে শুরু থেকেই লঘু করে দেখায়। সি আই ডি পৌঁছানোর আগেই বম্ব স্কোয়াড বা ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের না নিয়ে জেলা পুলিশ রিমোট কন্ট্রোলে তড়িঘড়ি মজুত বিস্ফোরকগুলোর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেয়। সব মিলিয়ে বিস্ফোরণের ডেরা তৈরী করা এবং চালিয়ে যাওয়ার পেছনে তৃণমূলের নেতাদের যোগসাজশ বা মদতের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী এবং গণআন্দোলন বিরোধী গোষ্ঠীর যোগসাজশের বিষয়টিকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু প্রশ্ন হলো তারা সীমান্ত পেরিয়ে অবাধে আসা যাওয়া করছে কিভাবে? এতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কি করছে!

একদিকে হিন্দুত্ববাদী ও কর্পোরেট সাম্প্রদায়িক ফ্যাসীবাদী শক্তির প্রচার অভিযান অপরদিকে সংখ্যালঘুদের রক্ষাকর্তা হিসাবে তৃণমূলের ভূমিকা—এই দুই প্রবণতা রাজ্যের মানুষের

চারের পাতায় দেখুন

পার্টির জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত চক্রবর্তী প্রয়াত

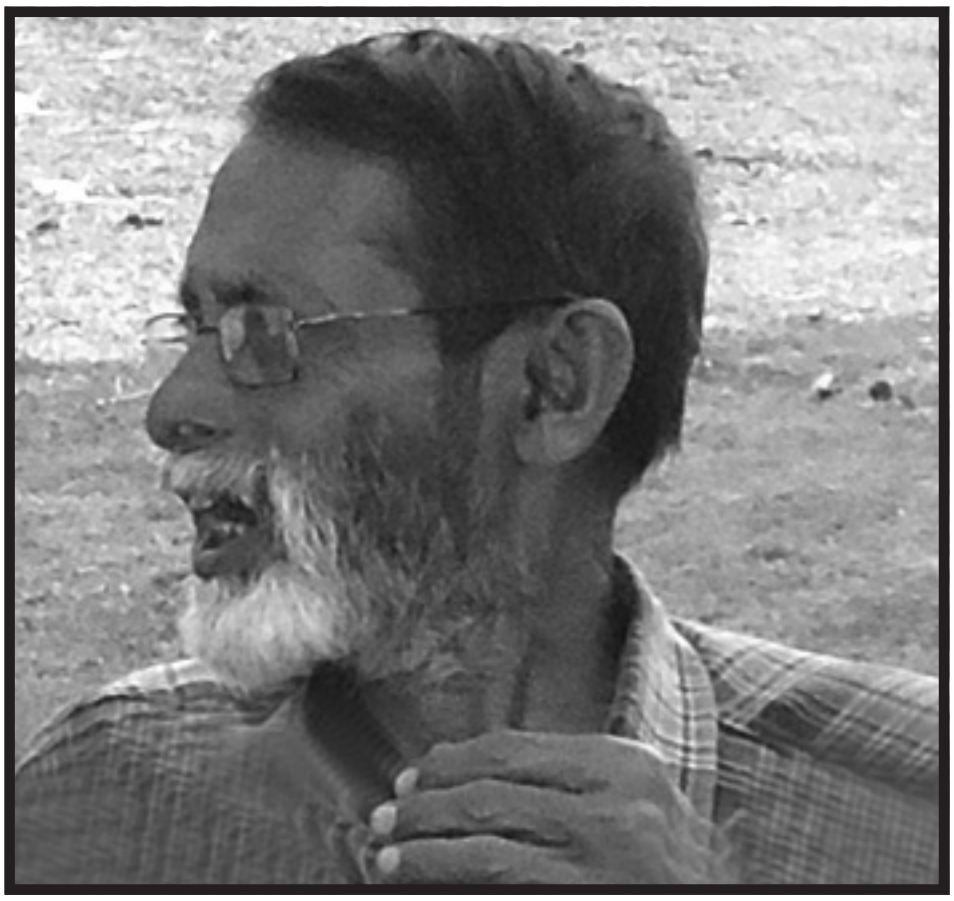

আকস্মিকভাবে মাথায় আঘাত ও রক্তক্ষরণের ফলে গত ২৮ সেপ্টেম্বর রাত ২টা ২০ মিনিট নাগাদ প্রয়াত হয়েছেন সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুব্রত চক্রবর্তী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী, কন্যা, জামাতা, অন্যান্য পরিজন সহ পার্টির ভেতরে ও বাইরের অসংখ্য গুণগ্রাহী মানুষকে।

বিগত প্রায় ৩-৪ মাস ধরে কমরেড সুব্রত চক্রবর্তী খুব ভুগছিলেন। পার্টির জেলা ও রাজ্যস্তরের নেতা-কর্মীদের আন্তরিক সহযোগ ও আধুনিক সমস্ত চিকিৎসা পদ্ধতি পেরিয়ে এসেও তাঁর অসুস্থতার চরিত্র চূড়ান্তভাবে জানা সম্ভব হয়নি। ডাক্তারদের পরামর্শে গৃহবন্দী থাকলেও তিনি অনেকাংশে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছিলেন। এরই মধ্যে ২৭ সেপ্টেম্বর সকালে তিনি বাড়ির কুয়োতলায় পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পান। তারপর তাঁকে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু কিছুতেই শেষ রক্ষা হল না। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে ডাক্তারদের অনুমান।

কমরেড সুব্রত চক্রবর্তীর জন্ম জলপাইগুড়ি শহরে। শহরে তাঁর পরিচিত মানুষেরা তাঁকে কুকু নামে চিনতেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন।

পুরানো উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে পড়তে পড়তেই তিনি পড়াশুনা ত্যাগ করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি উত্তাল নকশালবাড়ী আন্দোলনে যুক্ত হন। উক্ত পর্যায়ের নেতা কমরেড জয়ন্ত রায়ের নেতৃত্বে তিনি পার্টি কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেন। সত্তরের দশকের ব্যাপক পুলিশী দমন পীড়নের কারণে তিনি শিলিগুড়িতে দাদার বাড়ীতে আশ্রয় নেন। ১৯৭৪ সালে তিনি প্রতিরক্ষা দপ্তরে চাকরি পান। পার্টির পুনর্গঠন পর্যায়ে তিনি চাকরি ছেড়ে জলপাইগুড়ি চলে আসেন এবং পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে যান। এরপর তিনি পার্টির নির্দেশে তৎকালীন আলিপুরদুয়ার মহকুমার কামাখ্যাগুড়ি, বারভিসা, কুমারগ্রাম দুয়ারে পার্টির বিস্তারের কাজে অংশগ্রহণ করেন। তিনি কোচবিহারের ভেটাগুড়িতেও কিছুদিন পার্টি বিস্তারের কাজ করেন। পার্টি পুনর্গঠনের পর্যায়ে প্রথম অবস্থায় ''জলকো আঞ্চলিক কমিটি'' গঠিত হয়। কমরেড সুব্রত চক্রবর্তী প্রথম থেকেই উক্ত কমিটির সদস্য ছিলেন।

পরবর্তীতে তিনি পুনরায় জলপাইগুড়ি শহরে ফিরে আসেন এবং পার্টির নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করে যান। তিনি পর্যায়ক্রমে জলপাইগুড়ি শহর কমিটি ও সদর ব্লক কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রথম জলপাইগুড়ি জেলা কমিটি গঠিত হওয়া থেকেই জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

২০০৪ সালে তৎকালীন জেলা সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাস প্রয়াত হওয়ার পর কমরেড সুব্রত চক্রবর্তী জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে তিনি পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। মৃত্যুর প্রাক্ মুহূর্ত

পাঁচের পাতায় দেখুন

মোদীর ‘ভারত নির্মাণ করুন’ এবং ‘ভারতকে নির্মল করুন’ শ্লোগান দুটির পিছনে যে এজেণ্ডা রয়েছে

মোদী নির্বাচনী প্রচারে মোহ সৃষ্টিকারী ‘সুদিন’-এর যে বাগজাল বিস্তার করেছিলেন তার দুটি প্রধান প্রতিশ্রুতি ছিল ঃ মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা হবে এবং দুর্নীতি দূর করা হবে। কিন্তু নির্বাচন পরবর্তী পর্যায়ে মোদীর বক্তৃতা থেকে এই প্রতিশ্রুতিগুলো উধাও হয়ে গেছে। এর পরিবর্তে যে দুটি শ্লোগান এখন তাঁর বাচনিকতায় প্রাধান্য পাচ্ছে এবং ঐ বাচনিকতার মূল বিষয় হয়ে উঠছে তা হল ঃ ‘ভারতে নির্মাণ করুন’ এবং ‘ভারতকে নির্মল করুন’। স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে তাঁর ভাষণের তার এবং প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের মূল বিষয়ও ছিল এই দুটি শ্লোগান। আর এখন ‘মোদী’ জ্বরে আক্রান্ত মিডিয়ার কল্যাণে এই শ্লোগান দুটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

মোদীর ক্রমপ্রকাশমান এজেণ্ডা সম্পর্কে কি ইঙ্গিত দেয় এই শ্লোগান দুটি? এটা এখন অত্যন্ত স্পষ্ট যে, মূল্য নিয়ে কথা বলাটা মোদীর কাছে অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে। আর এটা বুঝতেও অসুবিধা হয় না যে, তথাকথিত ‘উন্নয়ন’-এর কথা বলে নির্বাচনে জেতার পর সংঘ বাহিনীর ‘লাভ জিহাদ’ ও ‘গো-সুরক্ষা’-র বিদ্বষমূলক এজেণ্ডাকে তুলে ধরাটা তাঁর পক্ষে অসুবিধাজনক বা সেটার প্রয়োজনও তাঁর নেই। সেটা করার জন্য বিজেপি বা সংঘ পরিবারের সংগঠনগুলোর অনেক নেতাই রয়েছে। অতএব সংঘ পরিবারের সেনানীরা এবং যোগী আদিত্যনাথ ও সাক্ষী মহারাজের মত নেতারা যখন অবাধে সাম্প্রদায়িক ও উগ্রজাতীয়তাবাদী বিদ্বেষ ছড়িয়ে চলেছেন, মোদী তখন প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ ও নির্মলীকরণ নিয়ে বাগজাল বিস্তার করছেন।

মোদী ও তাঁর অনুগামীরা আমাদের বোঝাতে চান যে, ‘ভারতে নির্মাণ করুন’ এই উদ্যোগটি আসলে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদনের এক চমকপ্রদ কেন্দ্র হিসাবে চীনের উত্থানের অভিজ্ঞতার আদলের উপরই ভিত্তি করা। মোদী অবশ্য খুব ভালো করেই জানেন যে, ঔপনিবেশিক আমলে সম্পদ পাচার ও লুণ্ঠনের তিক্ত ঐতিহাসিক স্মৃতি এবং সাম্প্রতিককালের বহুজাতিক সংস্থাগুলো সৃষ্ট বিপর্যয় ও চাপের অভিজ্ঞতার কারণে (ইউনিয়ন কার্বাইড, এনরণ, ভোডাফোন—এগুলো কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র) ভারতের সাধারণ জনগণ প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ সম্পর্কে খুব একটা উৎসাহিত নন। আর তাই গোটা ব্যাপারটায় একটা মেকি জাতীয়তাবাদী রঙ দিতে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগকে তিনি ব্যাখ্যা করছেন ‘ভারতের দ্রুত উন্নয়ন’ রূপে। এর চেয়ে মিথ্যা ও প্রতারণাময় দাবি সম্ভবত আর কিছু হতে পারে না। ভারতের মত বিশাল দেশের উন্নয়নকে চালিত করতে হবে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র থেকেই এবং নির্বিচার বিদেশী বিনিয়োগ ক্ষয়ক্ষতি ও নির্ভরশীলতার জন্মই দিতে পারে, উন্নয়ন ও জনকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে না।

চীনের প্রসঙ্গ টেনে আনার আগে আমাদের কয়েকটা বিষয় মনে রাখতে হবে। চীন যখন উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ আনতে শুরু করে তখন সে সামাজিক পুঁজি এবং বাস্তব পরিকাঠামো উভয়েরই এক পোক্ত কাঠামো তৈরি করে ফেলেছিল, আর সেটা সে করেছিল বিপ্লব পরবর্তী পর্যায়ে কয়েক দশক ধরে চলা ভূমি সংস্কার ও আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনের মধ্যে দিয়ে। চীনের অর্থনীতির বিকাশ ঘটানোর জন্য সে কখনই চীনে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ আসার ওপর নির্ভর করেনি। চীনে যে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ হয় তার বেশিরভাগটাই করে থাকে বিদেশে বসবাসকারী চীনারা। আর সাম্প্রতিককালে সারা বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের কবলগ্রস্ত হওয়ার পর চীন যখন বিশ্ব বাজারে সমস্যার কথা টের পেল তখন সে দ্রুতই তার দৃষ্টিকে ঘোরালো ভালো পরিমান মজুরি বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজারকে সম্প্রসারিত করে তোলার দিকে। প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগকে সামলানোর জন্য চীনের অধিকতর কার্যকরী একটা নিয়ন্ত্রণমূলক পরিকাঠামোও রয়েছে। আর এটাও আমরা জানি যে, চীনে ক্রমেই বেশি বেশি করে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের ঢোকাটা সে দেশের সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলেছে এবং তা সৃষ্টি হয়েছে পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি ও জনস্বাস্থ্য বা সামাজিক অসাম্য ও আঞ্চলিক বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলোতে।

এই সমস্ত কোন বিষয়েই চীনের সঙ্গে ভারতের তুলনা চলে না। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করতে মোদী তাদের সামনে তিনটি বিষয়কে তুলে ধরেছেন—গণতন্ত্র, জনসংখ্যা ও চাহিদা। এই তিনটি বিষয় কিন্তু অন্য একটি অনুল্লেখিত বিষয়কে আড়াল করতে পারছে না, আর সেটা হল ‘মরিয়াপনা’ যেটা প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগকে পরিচালিত করার ব্যাপারে ভারতের ক্ষমতা ও দরকষাকষির সামর্থ্যের হ্রাস ঘটাতে পারে। বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে মোদী ইতিমধ্যেই আমেরিকার ওষুধ তৈরি লবির চাপের কাছে নত হয়ে জীবনদায়ী ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণকে শিথিল করতে রাজি হয়েছেন এবং ভারতের পেটেন্ট আইনগুলো সম্পর্কে আমেরিকা নজরদারি চালাতে পারবে বলেও সম্মতি দিয়েছেন। আর প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের প্রেরণা হিসাবে তিনি যখন ‘গণতন্ত্র’র কথা বলছেন তার থেকে এটা স্পষ্ট যে, এর মধ্য দিয়ে তিনি এবারের নির্বাচনে তাঁর লাভ করা সংখ্যাগরিষ্ঠতাকেই বোঝাচ্ছেন, কখনই কর্পোরেট আগ্রাসনের মুখে ভারতের কৃষক, শ্রমিক ও উপভোক্তাদের নিজেদের অধিকার ও সম্পদ রক্ষার গণতান্ত্রিক অধিকারকে বোঝাচ্ছে না। শ্রম আইনকে উদার করে তোলা, পরিবেশ বিধিকে শিথিল করা এবং জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে আগ্রাসী হওয়ার পক্ষে মত পোষণ করে মোদী বস্তুত এটা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, বাছবিচারহীন বিনিয়ন্ত্রিত প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করতে তিনি ভারতের গণতন্ত্রকে সামরিক শৃঙ্খলে বাঁধতে চান।

মোদীর ‘ভারতকে নির্মল করুন’ কার্যক্রমও জনস্বার্থের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে ঝাপসা ও গুরুত্বহীন করে তোলাকেই দেখিয়ে দেয়। পরিবেশকে নির্মল ও স্বাস্থ্যকর করে তুলতে সবাইকে যেমন উৎসাহিত করতে হবে, তেমনি বিষাক্ত পুঁজিবাদের এই যুগে নির্মলীকরণের অভিযান কয়েকজন নেতা ও কেষ্টবিষ্টুদের দিয়ে শুরু হওয়া ও শেষ হতে পারে না, যাঁরা ঝাঁটা হাতে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান। গোটা দুনিয়াই যখন আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং পরিবেশের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার সমস্যার সঙ্গে যুঝছে, সেই সময় সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নটা সামনে আসছে তা হল—শিল্প দূষণ ও কর্পোরেট সৃষ্ট পরিমণ্ডলের ক্ষয়ক্ষতির মোকাবিলা ভারত কিভাবে করবে। উন্নত জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা আমাদের নির্মলীকরণ নেটওয়ার্ক ও ব্যবস্থাপনাকে ঢেলে সাজানোর দাবিও জানায়। মূল যে বিষয়গুলোর মুখোমুখি আমরা হই তার মধ্যে যেমন রয়েছে সাফাই কর্মীদের অবস্থা—একবিংশ শতাব্দীতেও তাদের কি অমর্যাদাকর ও জঘন্য পরিস্থিতিতে এবং কম বেতনে কাজ করতে হয়—তেমনি রয়েছে সাফাই ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরিকাঠামোর হাল। ‘ভারতকে নির্মল করুন অভিযান’ মোদীর কাছে প্রচারের আর একটা আড়ম্বরপূর্ণ প্রদর্শনীই শুধু নয়, এটা গান্ধীর উত্তরাধিকারকে হাতানো এবং আর এস এস এবং তার এজেণ্ডাকে বৈধ করে তোলারও মরিয়া প্রয়াস। গান্ধীর উত্তরাধিকারের উপনিবেশ-বিরোধী গণজাগরণ, অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতা এবং সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর বিষয়গুলোকে বাদ দিয়ে নির্মলীকরণের ইস্যুটিকে আলাদাভাবে বেছে নিয়ে মোদী নিজেকে এখন গান্ধীর এক উত্তরাধিকারী হিসেবে তুলে ধরতে চান, ঠিক যেমন সর্দার প্যাটেলের উত্তরাধিকারকে আত্মসাৎ করার চেষ্টাও তিনি এতদিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছেন। আর নির্মলীকরণ এজেণ্ডাকে ধরে গান্ধীর জন্মদিনে মোদী যখন প্রচারের আলোয় ভাসছিলেন, ঠিক তার পরদিনই বিজয়া দশমীতে জনগণের কাছে বক্তব্য রাখতে মোদী রেডিও মাধ্যমকে বেছে নিলেও তাঁর সরকার কলকাঠি নেড়ে চুপিসারে একটা বড় চাল দিয়ে দূরদর্শনকে বাধ্য করল আর এস এস প্রধান মোহন ভগবতের বিজয়া দশমীর ভাষণকে সম্প্রচার করতে।

এর আগের কোন এন ডি এ সরকারই সরকারি সম্প্রচার কেন্দ্রটিকে আর এস এস-এর প্রচার যন্ত্র হিসেবে খোলাখুলিভাবে অপব্যবহার করার সাহস দেখায়নি আর কোন প্রধানমন্ত্রীও কোন হিন্দু উৎসবের দিন জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দেননি। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতিরা বছর বছর ধরে দুই জাতীয় দিবস স্বাধীনতা দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবসেই জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে আসছেন। বিজয়া দশমী শুধু হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবের দিনই নয়, তা আর এস এস-এর প্রতিষ্ঠা দিবসও বটে। সেদিন আকাশবাণী ও সরকারি সম্প্রচার কেন্দ্র দূরদর্শনকে ব্যবহার করে জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দেওয়াটা আর এস এস এবং ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার তার লক্ষ্য ও এজেণ্ডা সিদ্ধির জন্য ক্ষমতার নির্লজ্জ অপব্যবহার।

মোদী সরকার যখন নির্বিচার প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগকে এবং আর এস এস-এর সর্বত্র ঢুকে পড়াকে সুপরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মঞ্চ হয়ে উঠছে, তখন ভারতের নির্মলীকরণ অভিযানকে রাস্তার আবর্জনার বিরুদ্ধে যেমন চালিত করতে হবে, তেমনই গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি সৃষ্ট বিপদের বিরুদ্ধেও চালিত করতে হবে।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ৭ অক্টোবর ২০১৪)

সম্পাদকীয়

দূর্যোগের ঘনঘটা

বিজেপি-আর এস এস-বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মনে করছে পশ্চিমবঙ্গে তাদের নবযুগ আসন্ন। তারা জোট বাঁধছে। ক্রমেই আক্রমণাত্মক হচ্ছে সবক্ষেত্রে হস্তক্ষেপে এবং আত্মপ্রচারে। চালাচ্ছে রাজনৈতিক জমি দখলের অভিযান। আগ্রাসনটা নামিয়েছে বহুমাত্রিক কর্মসূচী ভিত্তিক। ওপর থেকে নিচে, নিচের থেকে ওপরে। তারই এক নির্দিষ্ট ছক—আগামী ডিসেম্বরের মাঝামাঝি আর এস এস জনসভা করবে এরাজ্যে, খোদ কলকাতায় শহীদ মিনারে। উপলক্ষ—বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ‘সুবর্ণ জয়ন্তী’ উদ্‌যাপন; লক্ষ্যটা বলার অপেক্ষা রাখে না—পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যেই সেনাবাহিনীর অনুমোদন মিলে গেছে। সিদ্ধান্ত-উদ্দেশ্য-পরিকল্পনা বেশ প্রকটভাবেই ধরা পড়ছে। অন্তর্নিহিত প্রহসনও লক্ষ্যণীয়। এদেশের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির আড়াইশো বছরের লড়াই ও আত্মত্যাগের গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। যে ইতিহাসে হিন্দুত্বের শক্তিগুলোর নিজেদের ‘কৃতিত্ব’ দেখানোর উপায় নেই। এমনকি সাম্রাজ্যবাদী সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও গাঁটছড়া থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য আবশ্যিক প্রয়োজন যে দ্বিতীয় আজাদীর লড়াই, এ প্রশ্নেও ঐ ত্রয়ীশক্তি রীতিমত দ্বিতীয় বিশ্বাসঘাতকতারই পতাকাবাহী। মোদীর তরফে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এবারের স্বাধীনতা দিবসে বহুজাতিক পুঁজির দুনিয়ার উদ্দেশে ভারতে অবাধে বিনিয়োগের আহ্বান, মার্কিন দেশে গিয়ে পুঁজিকে উদ্বাহু আবাহন জানাতে ম্যাডিসন স্কোয়ারে দেওয়া বিগলিত ভাষণ—এসবের মধ্যে দিয়েও কি দেশের জন্য ‘ত্যাগ’ ও ‘শহীদত্ব’ প্রমাণের কোনও সুযোগ রয়েছে! নেই যখন, তাহলে আর তাদের নিজেদের আগমার্কা ‘দেশপ্রেমিক’ দাবি করার বা শহীদ মিনারের পাদদেশে সভা করার কোন্ তাৎপর্য থাকতে পারে? পারে না। কিন্তু তবু সেই ধৃষ্টতা তারা দেখাতে চায় ক্ষমতার দৌলতে যা নয় তাই প্রচার করতে, বিস্তারের সম্ভাবনার গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঝাঁপাতে। কেন্দ্রের ক্ষমতার কারণে সেনাবাহিনীই যখন নিজেদের এ্যক্তিয়ারে তখন সভাস্থলের জন্য তার বিভাগীয় ছাড়পত্র মেলার আনুষ্ঠানিক সীলমোহর পেতে আর অসুবিধা কি!

তৃণমূল মার্কা ‘পবিরর্তনের’ জমানায় পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি ক্রমেই অশান্ত অস্থির হয়ে পড়ছে। নানা মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুতর কারণেই এই ক্রমপরিবর্তন প্রবহমান। তার সাথে অবশ্যই অধঃপতিত বাম জমানার প্রতি অসন্তোষের জের থাকার নির্মম বাস্তবতাও রয়েছে। এই বিচিত্র সময়ের সুযোগ নিয়েই দক্ষিণপন্থার সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলো পুরোদমে নেমে পড়েছে নিচের দিক থেকে সমাজ কাঠামোর দখল অভিযানে। তার জন্য চাইছে সমাজ ও রাজনীতির তীব্র সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ। সেই উদ্দেশ্যে সামনে আনছে কতকগুলো বিস্ফোরক ইস্যু। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের ইস্যু ওদের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত পুঁজি, এখন সেটাকে মনে করছে ভাঙ্গিয়ে ভালো রাজনৈতিক বাজারদাম পাওয়ার সময় এসেছে। বিজেপির দাবি—অনুপ্রবেশের পরিণতিতে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে জনবিন্যাস-জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে ভারসাম্য বিরাটভাবে ভেঙ্গে পড়ছে। এই দাবির হয়ত কিঞ্চিৎ বাস্তবতা থাকতে পারে, কিন্তু তাকে বিজেপি যেভাবে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দাবি করছে সেটা তাদের বিশেষ সাম্প্রদায়িক-রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক বিকৃত প্রচার। দেশের জাতীয় অর্থনীতি, জনগণের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্র ও অধিকারগুলো যেখানে বিদেশী বহুজাতিক পুঁজির অবাধ অনুপ্রবেশে আর দেশের কর্পোরেট পুঁজির শোষণ-লুণ্ঠন-পেষণে প্রতিনিয়ত তছনছ হচ্ছে, আর এসব ব্যাপারে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপির ভূমিকা যেখানে রাজনৈতিক দোসরের, সেই দল আবার বাংলার সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর জনগণের আর্থ-সামাজিক সর্বনাশ হওয়ার যত দোষ দেখাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের সমস্যার মধ্যে!

বর্ধমানের খাগড়াগড়কাণ্ডের পর পদ্ম প্রতীকের দল আরও ঝড় তুলতে চাইছে। পেয়ে গেছে মুসলিম সন্ত্রাসবাদকে মোকাবিলা করার নামে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জিগির তোলার অ্যাজেণ্ডা। এটা ঘটনা যে, তৃণমূলের পট-‘পরিবর্তন’ নিয়ে আসা আমলে চোরাপথে সারদার টাকা বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তি জামাতের কাছে যাওয়ার, জামাতের টাকা আবার পশ্চিমবঙ্গে আসার খবর বাড়ছে। এসবের সাথে একদিকে তৃণমূলের সংখ্যালঘু বর্গ পরিচিতির সাংসদ থেকে শুরু করে অন্যদিকে তৃণমূলস্তরের পার্টি অফিস, মোড়ল-মাতব্বর-সম্পর্কযুক্ত জেহাদী সন্ত্রাসীদের খবরাখবরও ছড়াচ্ছে। বহু মাদ্রাসায় জঙ্গী প্রশিক্ষণের সূতিকাগারে পরিণত হওয়ার কাহিনী নাকি রাজ্যের গোয়েন্দারা চেপে যাচ্ছে, কেন্দ্রের গোয়েন্দারা খুঁজে বার করছে! এসবের প্রকৃত সত্যের প্রকাশ ও নিরসন হওয়া অবশ্যই জরুরী। জনগণের স্বার্থেই তা প্রয়োজন। কিন্তু এই মতলবে বিজেপি-আর এস এস-বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বাহিনীর গলাবাজী করার নৈতিক-রাজনৈতিক অধিকার নেই। যদিও এই সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের শক্তিগুলো এরাজ্যে শেকড়-বাকড়-ডালপালা ছড়াচ্ছে। তাদের শাখা-প্রশাখা-প্রশিক্ষণ শিবির জংলার মত বাড়াচ্ছে। ধোয়া তুলসীপাতা পুজো করতে নয়, গেরুয়া সাঁজোয়া বাহিনী সাজাতেই।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন

অতঃপর পর্বত মূষিক প্রসব করিল। যাহার যা ধর্ম। প্রাক্তন বিজেপি নেতা মাননীয় রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী মহাশয় গুণীজন, বিদ্বজ্জন রাজনৈতিক নেতা, জুটা নেতৃত্ব, প্রাক্তনী, প্রাক্তন উপাচার্য, ছাত্র নেতৃত্ব ও শিক্ষামন্ত্রীর সহিত বিস্তর আলাপ আলোচনার পরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, অন্য সবাই ভিন্নমত পোষণ করিলেও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যাহা বলিতেছেন তাহাই সঠিক। অতএব, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসাধিক কাল ধরিয়া যে সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিয়াছে তাহার জন্য বহিরাগত কুজন ও নকশালবাদীরাই দায়ী, অস্থায়ী উপাচার্য ডঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী যাহা করিয়াছেন সঠিক করিয়াছেন; সুতরাং তাহার পদোন্নতি না হইলেও পদস্থিতি অবশ্যই প্রাপ্য এবং যেহেতু, উপাচার্য সন্ধান সমিতি সারা ভারত (সম্ভবত দেশ বিদেশ) ছেঁচিয়া তাহার মত গুণীজনকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন ও তালিকার সর্বাগ্রে রাখিয়াছেন তাই তাঁহাকেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য হিসাবে নিয়োগপত্র দিয়াছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়। ইহার মধ্যেই লুক্কায়িত রহিয়াছে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাঙ্গনকে গণতান্ত্রিকীরণের ও বিরাজনীতিকরণের ধাঁধা।

একইদিনে আচার্য তথা রাজ্যপাল মহোদয় দু-দুটি আদেশনামা স্বাক্ষর করেছেন। একটি সিধো-কানহু, অপরটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত। সিধো-কানহু বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য ডঃ শমিতা মান্না তাঁর পদটি খুইয়েছেন, যদিও আগেই একটি আদেশবলে তাঁকে প্রথম উপাচার্য হিসেবে ৫ অক্টোবরের পরেও কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছিল। কিন্তু কোন এক আজানা কারণে তিনি রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের বিরাগভাজন হয়ে পড়লেন ও আগের আদেশকে বাতিল করে তাঁর জায়গায় বর্তমান ডি পি আই ডঃ দীপক মণ্ডলকে প্রথম উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করা হল। আদেশটির কৌতুকের দিক হল, শমিতা দেবী ছিলেন প্রথম উপাচার্য আর দীপকবাবুও তাই হলেন। যুগ্ম প্রথম এমনটাও বলা যাবে না। শমিতা দেবীর বিরুদ্ধে পুলিশ দিয়ে ছাত্র ঠ্যাঙানোর কোন অভিযোগ নেই, তবে শোনা যাচ্ছে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের লোক হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতাবান তৃণমূল অধ্যাপক নেতার কথা শুনছিলেন না। মনে রাখা দরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজনীতিকরণের কথা সোচ্চারে বলে এই সরকার ক্ষমতায় এসেছিল। অপরদিকে অভিজিৎবাবু আগেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য ছিলেন। পূর্বতন উপাচার্য সার্চ কমিটি তাঁকে খুঁজে পাননি সেই সময়ে। তিনি তখন যোগ্য ছিলেন না। কিন্তু তখন সার্চ কমিটির মাধ্যমে নিযুক্ত উপাচার্য তৃণমূল সরকারের সঙ্গে মানিয়ে না নিতে পারায় পদত্যাগ করে চলে যান। আবার তৃণমূল ঘনিষ্ঠ অভিজিৎবাবুকে অস্থায়ী উপাচার্য করা হয়। এবারে মোটামুটি জানাই ছিল সার্চ কমিটি তাঁকেই বাছবেন উপাচার্যের প্যানেলে এক নম্বর হিসেবে। সেটাই করা হয়েছিল, তবে পুলিশ এনে ছাত্র ঠ্যাঙানোর আগেই তেমনটা হয়েছিল। ধারণা হয়েছিল, শিক্ষাবিদ রাজ্যপাল তথা আচার্য হয়তো ১৬ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পরে তাঁকে নিয়োগ না করে সার্চ কমিটি কর্তৃক পাঠানো অন্য দুজনের মধ্যে কাউকে নিয়োগ করবেন। ধারণাটা আরেকটু জোরালো হয়েছিল বিজেপি উপাচার্যের বিরোধিতা করায়। কিন্তু রাজ্যপাল বা আচার্য শিক্ষা দপ্তরের ও সরকারের সাথে কোন বিরোধে না গিয়ে নীরবে বিনা বাক্যব্যয়ে আদেশনামায় স্বাক্ষর করলেন।

এমনটাই হওয়ার ছিল। কারণ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনরত ছাত্ররা যতই আন্দোলনকে রাজনীতিমুক্ত রাখতে চাক না কেন, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে তা কখনোই অরাজনৈতিক থাকতে পারে না। যে কোন আন্দোলনকেই রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের পক্ষে টানতে চাইবে বা সেই আন্দোলন থেকে ফায়দা নিতে চাইবে। এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে কোন রাজনৈতিক দল বা দলসমূহ শিক্ষাঙ্গনে গণতন্ত্র চায়, ক্যাম্পাসে পুলিশ চায় না, গুণ্ডাদের গুণ্ডাগিরি চায় না সেটা ভাবনায় রাখতে হবে বৈকি। উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রেও আচার্য রাজ্যপাল নিজের দলের স্বার্থই দেখেছেন, গণতন্ত্রের নয়, ছাত্রদের নয়, শিক্ষকদের নয়, শিক্ষার নয়। যদি তিনি উপাচার্যকে স্থায়ী নিয়োগে আপত্তি করতেন এবং রাজ্য সরকার তা মেনে নিত, তাহলে হয়তো আপাতভাবে বিজেপির মুখ সাময়িক উজ্জ্বল হত; কিন্তু যাদবপুর নিয়ে তাদের আন্দোলনেরও সমাপ্তি ঘটত। বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের ভিত বাড়ানোর রাস্তা চাইছে। তার জন্য তাঁদের চাই ধারাবাহিক আন্দোলন, যেটা গড়ে তোলার মত শক্তি তাঁদের নেই। তাঁরা ঘোলাজলে মাছ ধরতে চাইবে। যাদবপুর আন্দোলনকে যদি জিইয়ে রাখা যায়, তাহলে তাঁদের লাভ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনের মূল দাবি এখনও উপাচার্যের অপসারণ বা পদত্যাগ। সেটাকে বাস্তবায়িত করতে দিয়ে বিজেপির স্থায়ী লাভ নেই। তারা এবং তাদের দলপতি রাজ্যপাল কখনই ক্যাম্পাসে গণতন্ত্রের পক্ষপাতি নয়। মধ্যপ্রদেশে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সময় তারাই এক অধ্যাপককে খুন করেছিল। এই সেদিন কাশ্মীরে বন্যাত্রাণে সাহায্যের জন্য আবেদন জানানোয় তারাই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে যারপরনাই হেনস্থা করেছে। রাজ্যপাল বিজেপির রাজনৈতিক লাভ দেখেছেন। একদিকে তিনি অভিজিৎবাবুর স্থায়িত্বে সীলমোহর লাগিয়েছেন, অন্যদিকে রাহুল সিংহ উপাচার্যের স্থায়ী নিয়োগের বিরোধিতা করছেন। একেই বলে পথিমধ্যে বিষ্ঠাত্যাগ করে রক্তচক্ষু প্রদর্শন করা।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন আগামীতে কী গতি প্রকৃতি নেয় তার দিকে সারা রাজ্যের বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক মানুষজন তো বটেই, সারা দেশ ও বিশ্বের ওয়াকিবহাল মহলও তাকিয়ে আছে। সাধারণত এই ধরণের অভিজাত বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন উদার গণতান্ত্রিক চেতনাসমৃদ্ধ ছাত্রীছাত্ররা পড়াশোনা করে তেমনই তাঁদের কেরিয়ার করার আকাঙ্খাও থাকে প্রবল। যদি তাঁরা ক্লাস বয়কট চালিয়ে যেতে থাকে, তাহলে তাদের কেরিয়ার ধাক্কা খাওয়ার ঝুঁকিও থাকে। কিন্তু যদি সেই গণতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া যায় তাহলে তা একদিকে উজ্জ্বল ও বিরল উদাহরণ হয়ে উঠবে, অন্যদিকে তা সরকার ও কর্তৃপক্ষ এবং উপাচার্যকে পর্যুদস্ত করবে। অপরদিকে যাদবপুরের আন্দোলন যে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাস গণতন্ত্রের কলরব তুলেছে সেই ক্যাম্পাসে গণতন্ত্রের আওয়াজ যদি সারা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র সব কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তোলা যায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র রাজনীতি আবার সারা ভারতকে দিশা দেখাবে। কেন না, বামফ্রন্ট আমল থেকে বা তারও আগে ১৯৭২ সাল থেকেই ক্যাম্পাস গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার যে কর্মসূচী শাসক দল ও তাদের অনুগামী ছাত্র সংগঠন ছাত্র পরিষদ, এস এফ আই নিয়েছিল তা আজও চলছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন কিছুতেই আর যাদবপুর ক্যাম্পাসে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না, তা উচিতও নয়। সময় ও সমাজের দাবি তাকে অন্য সব ৫ শতাধিক ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে দেওয়ার। তার দায়িত্ব গণতন্ত্র সচেতন এই আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী ছাত্রদেরই নিতে হবে। অবশ্যই সেই আন্দোলনে লিঙ্গ ন্যায়ের (জেণ্ডার জাস্টিস্) বিষয়টিকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে সেই ২৮ আগস্ট ঘটে যাওয়া ছাত্রী নিগ্রহের জন্য দোষীদের (যারাই দোষী হোক না কেন) শাস্তি আবশ্যিক করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে ছাত্রদের মধ্যে কে কবে কী অবস্থান নিয়েছিল তার থেকেও অনেক প্রয়োজনীয় লিঙ্গ-ন্যায় ও ক্যাম্পাস গণতন্ত্রের প্রশ্নে কোন অবস্থান তাঁরা এখন গ্রহণ করছে।

- অমিত দাশগুপ্ত

যাদবপুরের ছাত্র আন্দোলন প্রসঙ্গে আইসা'র ছাত্র কমরেডদের সাথে আলোচনা সভায় পার্টির সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য

ক্যাম্পাস গণতন্ত্র এবং গোটা দেশের গণতন্ত্রের প্রশ্ন—দুটোই আজকের সময়ের জ্বলন্ত দাবি। যাদবপুরের ছাত্র আন্দোলন দেখিয়ে দিল ঐ দুটো বিষয়ই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকরা সংবেদনশীল হলে বিষয়টা ক্যাম্পাসেই মিটতে পারতো। কিন্তু সরকার, পুলিশ, গুণ্ডাদের সম্মিলিত হামলা ক্যাম্পাসের ভেতরের আন্দোলনকে রাজপথে নিয়ে এলো। ব্যাপক মানুষ সেই আন্দোলনে যুক্ত হলো। আজকে পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেকটি মানুষই অনুভব করছে রাজ্যে গণতন্ত্র নেই, এমনকি কার্টুন আঁকার জন্য পুলিশী হেফাজতে যেতে হচ্ছে। যাদবপুরের আন্দোলন সমস্ত মানুষকে নাড়া দিয়ে গেছে। রাজ্যপালের উচিত ছাত্রদের দাবিগুলো সংবেদনশীলতার সাথে মেনে নেওয়া। এটাকে প্রেস্টিজ ইস্যু বানানো উচিত নয়। গণতন্ত্রের প্রতিটি দাবিই ন্যায়সঙ্গত। ছাত্রদের আন্দোলন প্রথমে ছাত্রীর যৌন হেনস্থার তদন্তের দাবিতে শুরু হয়, পরবর্তী ঘটনাবলীতে ভিসি-র পদত্যাগের দাবি উঠে আসে। এই দাবিগুলো মেনে নেওয়া উচিত, ছাত্ররা যাতে কনফিডেন্স পায় সেটাকে সুনিশ্চিত করা উচিত। টি এম সি পি ছাত্রদের নিন্দা করে, অপপ্রচার চালিয়ে মিছিল করে। দেখা গেছে সেই মিছিলেরও একটা অংশ যাদবপুরের ছাত্রদের সমর্থন করেছে। তাই সমগ্র সমাজ থেকে আজ দাবি উঠছে—দলীয় রাজনীতি নয়, ক্ষমতার ঔদ্ধত্য নয়, আন্দোলনের মধ্য থেকে উঠে আসা দাবিগুলোকে মান্যতা দিতে হবে। এগুলো ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলনের ইস্যু। যেখানে ডান বাম সকলেই পক্ষে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবাংলার বুকে আর্থিক দুর্নীতির প্রশ্ন ব্যাপক মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কোলগেট দুর্নীতি সরকারি কোষাগারের বড় মাত্রায় লুট, কিন্তু পশ্চিমবাংলার আর্থিক দুর্নীতি—যা লক্ষ লক্ষ মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আমরা যখন গণতন্ত্রের কথা বলি সেটা নিছক ভোটের দিকে তাকিয়ে নয়, বেঁচে থাকার অধিকার যে বিভিন্নভাবে খর্ব হচ্ছে সেই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বলি।

এ রাজ্যের শাসক তৃণমূল সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ফসল ঘরে তুলেছে বলে জনবিরোধী কাজের লাইসেন্স পেয়ে যায়নি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ হবে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে রাতের আলো নিভিয়ে পুলিশ ও গুণ্ডারা ছাত্র-ছাত্রীদের উপর হামলা করলো। এর প্রতিবাদে যে আন্দোলন গড়ে উঠলো সেটা শুধু মমতা ব্যানার্জী নয়, দিল্লীর সরকারের বিরুদ্ধেও সতর্কবার্তা দিয়েছে। ন্যূনতম সংবেদনশীলতা না দেখিয়ে ক্ষমতার দাপটের সরকারি মনোভাবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ইতিহাস আছে। সি পি এম বামপন্থাকে কলুষিত করেছে—তাই মানুষের দাবি বামপন্থার নতুন জাগরণ। ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নতুন মাইণ্ড সেট সামনে উঠে এসেছে, একে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

যাদবপুরের সংগ্রামী ছাত্র কমরেডদের অভিনন্দন জানাই। এই আন্দোলন একটা চলমান বিষয়। ভিসি-র পদত্যাগের দাবিই শুধু নয়, লালবাজার অভিযানে ছাত্ররা যাচ্ছে সেটা পুলিশী নির্যাতনের গুরুত্বপূর্ণ দাবিতে। ছাত্রীর উপর যৌন হেনস্থার প্রশ্নটা জেণ্ডার জাস্টিসের বিষয়, পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত দাবি। ছাত্র আন্দোলনে অপার্টি শক্তি দীর্ঘদিন ধরেই আছে; নানা ধরণের প্রবণতা থাকবে—প্রতিযোগিতাও থাকবে। আন্দোলন বিপ্লবী গণতন্ত্রের অগ্রণী ছাত্র সংগঠন আইসার উপর পুলিশী নির্যাতন হয়েছে সবচেয়ে বেশী। তাদের ভাবতে হবে আইসার পরিচিতি বাড়ানোর কাজে গুরুত্ব দিতে হবে। আইসার সম্প্রসারণের বিষয়টাতে জোর দিতে হবে। রাজ্যজুড়ে প্রচার ছড়িয়ে দিতে হবে। আন্দোলনের পর্যালোচনা করে আন্দোলন ও সংগঠন দুটোর মেলবন্ধন করতে অগ্রণী ছাত্রদের বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে।

অশোকনগরে আইসা'র উদ্যোগে প্রতিবাদী চলচ্চিত্র উৎসব

গত ১০-১১ অক্টোবর আইসার অশোকনগর শাখার উদ্যোগে এবং 'প্রতিরোধের সিনেমার' সহযোগিতায় দুদিনব্যাপী চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হল। ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ মিলিয়ে মোট ৮টি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী চলচ্চিত্র নিয়ে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র সমাজের শিক্ষা, কর্মসংস্থানের দাবিগুলো নিয়ে লড়াইয়ের পাশাপাশি বৃহত্তর দেশ ও সমাজের সাথে পরিচয় করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই প্রয়াস। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে গত কয়েকদিন ব্যাপক প্রচার ও অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে একে সফল করে। প্রথম দিনের উৎসব উদ্বোধন করে ছাত্রী অঙ্গনা। দ্বিতীয় দিন ছাত্র কুমারজিৎ।

অনুষ্ঠানের উদ্যোগপর্বে ২৩ সেপ্টেম্বর যাদবপুর ছাত্র নিপীড়নের প্রতিবাদে মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর ছাত্র, শিক্ষক, নাগরিকদের এক বিশাল প্রতিবাদী মিছিলে আইসার ছাত্র-ছাত্রীরা অগ্রণী ভূমিকা রাখে। ছাত্র সংগঠক সুমি মজুমদারের নেতৃত্বে সঞ্জীবন, অঙ্কন, প্রসূনের মতো ছাত্ররা আরও বৃহত্তর ছাত্র সমাজের কাছে আইসাকে নিয়ে যাওয়া পরিকল্পনা নেয়। উৎসবের দ্বিতীয় দিন কস্তুরী পরিচালিত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ শীর্ষক চলচ্চিত্রের উপর এক প্যানেল আলোচনা হয়। যেখানে যাদবপুরের আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীরা গোটা আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করেন। আলোচনায় অংশ নেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিনায়ক ভট্টাচার্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রায় ৪ মাসের ওপর ''আজকের দেশব্রতী''-র সম্পাদনা এবং ডি টি পি কাজের সেন্টার ক্রীক রো অফিস থেকে রাজাবাজার অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে। তাই পত্রিকায় যা কিছু ছাপার জন্য সবই সরাসরি ই-মেইল করে পাঠানোর নতুন উদ্যোগ শুরু করা দরকার। সম্পাদনার কাজ এবং ডি টি পি কাজের আবশ্যিক সুব্যবস্থার স্বার্থে এই নতুন ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করার জন্য একান্তভাবে আবেদন জানানো হচ্ছে। —সম্পাদক।

e-mail : deshabrati@gmail.com

সারদা সি বি আই তদন্ত কোন অভিমুখে?

প্রথমে শোনা গিয়েছিল জনগণের কাছ থেকে লুট করা টাকার পরিমাণ ২৫০০ কোটি টাকা। এখন জানা যাচ্ছে এই পরিমাণ হবে ১০ হাজার কোটি টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সংখ্যা ১৭ লক্ষ। এর মধ্যে ৮৩ শতাংশ হলেন গরীব জনগণ। সারদার এই লুণ্ঠন কাজে পুরোহিত হল শাসক পার্টি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতারা।

রাজ্যের ক্ষমতায় আসার সময় তৃণমূল কংগ্রেস বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ কতটা পেয়েছিল তা স্পষ্ট বোঝা না গেলেও ফাটকা পুঁজির মালিক সারদা গোষ্ঠী ও তার প্রধান সুদীপ্ত সেন তৃণমূলের সমর্থনে পুরোদমে খেটে গেছে, তৃণমূলের নির্বাচনী প্রচার কাজে অর্থ জুগিয়ে গেছে। তৃণমূল কংগ্রেসও এর প্রতিদান দিয়েছে, সরকারের আশীর্বাদে ফুলে ফেঁপে ওঠে সারদা। আর তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারাও লুটের টাকায় ভালো পরিমাণ ভাগ বসিয়েছে—তা পার্টির জন্যও বটে, নিজেদের জন্যও বটে।

কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি, শেষ রক্ষা হওয়া সম্ভবও ছিল না। ইতিমধ্যে প্রায় ১০০ জন আমানতকারী ও এজেন্ট সর্বস্বান্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছেন। সারদা কেলেঙ্কারী সংবাদ মাধ্যমের শিরোনাম হয়েছে। বঞ্চিত আমানতকারীরা টাকা ফেরতের দাবিতে রাস্তায় নেমেছেন। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোও এই লুটের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। বিরোধীতার হাওয়াকে সামাল দিতে তৃণমূল সরকার এক তদন্ত কমিশন গঠন করে, গরীব আমানতকারীদের ক্ষতিপূরণ দিতে সরকারি টাকায় ৫০০ কোটি টাকার এক তহবিল তৈরী করে, রাজ্য পুলিশকে দিয়ে সারদা কর্তাদের গ্রেপ্তার করে ও তদন্ত শুরু করে। শাসক নেতারা নিজেদের ২/১ জনকে বলির পাঁঠা করে নিজেরা আড়ালে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। কিন্তু এই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। তাদের হাজার বিরোধীতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের রায়ে সি বি আই তদন্ত শুরু হয়। তদন্ত শুরুর গোড়া থেকেই রাজ্য সরকার অসহযোগীতা করে আসছে। রাস্তায় নেমে সি বি আই তদন্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। আইনমন্ত্রীও তার দলবল নিয়ে সি বি আই দপ্তরে গিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, সর্বোপরি তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ অনেক প্রমাণ-নথি পুলিশের সাহায্যে সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু সি বি আই তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যেই সি বি আই তৃণমূল কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতা, সাংসদ, রাজ্য সরকারের মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কুণাল ঘোষ আগেই রাজ্য পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিল, সি বি আই গ্রেপ্তার করে প্রাক্তন অন্যতম পুলিশ প্রধান, তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি কুখ্যাত রজত মজুমদারকে। বলা হয়েছে কান টানলে মাথা আসে। কিন্তু মাথা সেভাবে এখনও জালে আসেনি।

সারদা কেলেঙ্কারী নিয়ে বিজেপিও কম সোচ্চার নয়। কিন্তু জনগণের টাকা কোন সংস্থা লুট করলে তাদের তো বিরোধিতা থাকার কথা নয়। তারা নিজেরাও তো এই কাজই চালিয়ে যায়। তা সে কর্ণাটকের ইয়েদুরেপ্পা ও রেড্ডি ভাইয়েরা হোক, বঙ্গারু লক্ষ্মণ হোক বা নীতিন গড়করি হোক। তবু জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা না থাকুক, তৃণমূল কংগ্রেসকে কোণঠাসা করার রাজনৈতিক স্বার্থ তো আছে। এটা তাদের কাছে আশু স্বার্থ। তাদের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ হোল সমাজে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটানো। সারদাকাণ্ডেও তারা সাম্প্রদায়িকতার রং লাগিয়েছে। কেননা অভিযোগ উঠেছে যে সারদার টাকা বাংলাদেশের জামাত সংগঠনের হাতে পৌঁছেছে।

ইতিমধ্যে খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণ ধরে প্রতিদিনই সংশ্লিষ্ট অনেক মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের নাম, আস্তানা এবং আরও বিস্ফোরণের খবর সংবাদপত্রের শিরোনাম হচ্ছে। অভিযোগ যে তৃণমূলের সাহায্যেই সন্ত্রাসবাদীরা পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছে। বেআইনি অনুপ্রবেশের ইস্যুটি বিজেপি অনেক আগেই তুলেছে। এখন সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটাবার জন্য এক বিরাট অস্ত্রভাণ্ডার বিজেপির সামনে উপস্থিত। বিজেপি সম্ভবত নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে এটাকেই এক বড় সুযোগ হিসাবে দেখছে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার অভিযোগ এনে সরব হয়েছে বিজেপি এবং সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত। শোনা যাচ্ছে ২০ ডিসেম্বর শহীদ মিনার ময়দানে সংঘ প্রধান ভাগবত ভাষণ দেবেন।

এখন সারদা কেলেঙ্কারীর তদন্ত কি তার যুক্তিসঙ্গত পরিণতির দিকে এগোবে? এখন যে হাত কানে পড়েছে তা কি মাথা পর্যন্ত পৌঁছাবে? এখনও পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে তাতে তদন্ত আরও ছড়িয়ে পড়ছে, আরও নীচের দিকে যাচ্ছে। মাথা পর্যন্ত না যাওয়ার যে আশঙ্কা তার এক বাস্তব কারণ আছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির কাছে এখন এক রণনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। এই রাজ্যে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্যে রেখে বিজেপি প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিজেপির রণনীতি হল তৃণমূল সরকারকে ক্রমান্বয়ে জনবিচ্ছিন্ন করে তোলা এবং সংগঠনের বিস্তার ঘটিয়ে চলা। এখনই তৃণমূল সরকার অস্থিতিশীল বা টালমাটাল অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলে তাদের বিশেষ কোন লাভ নেই। তা ছাড়া সাম্প্রতিক বিভিন্ন রাজ্যে যে বিধানসভা নির্বাচনগুলো অনুষ্ঠিত হল তা মোদীর কাছে বেশ অশুভই। তাই সি বি আই তদন্ত মাথা পর্যন্ত নাও যেতে পারে। সি বি আই যে কেন্দ্রের শাসক দলের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহৃত হয় তা সততই দেখা গেছে। সুপ্রীম কোর্টও সি বি আই-কে ''খাঁচায় থাকা তোতা পাখি'' বলে ভর্ৎসনা করেছে। এক্ষেত্রেও কোন ব্যতিক্রম না ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। সারদা তদন্ত যদিও সুপ্রীম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে হচ্ছে তবুও তদন্ত কাজ তার স্বাভাবিক পরিণতিতে নাও পৌঁছাতে পারে। এ ব্যাপারে সংগ্রামী শক্তিদের সজাগ থাকতে হবে। সমস্ত অপরাধীদের কাঠগড়ায় তোলা না পর্যন্ত এবং লুটের টাকা ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত সংগ্রামী শক্তিদের আন্দোলনের ময়দানেই থাকতে হবে। কেন না এখানে ১৭ লক্ষ মানুষের স্বার্থ জড়িত।

- কল্যাণ গোস্বামী

বর্ধমান বিস্ফোরণ স্থল পরিদর্শনে ...

একের পাতার পর

সম্প্রীতি ও ঐক্যের পরিবেশকে ধ্বংস করছে। জনগণের জীবন জীবিকার জ্বলন্ত সমস্যাগুলো যথা, মূল্য বৃদ্ধি, বেকারী, কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া, আর্থিক কেলেঙ্কারি, কৃষক আত্মহত্যা প্রভৃতিকে ধামাচাপা দিতে কেন্দ্র ও রাজ্য শাসকদের ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান সি পি আই (এম এল) পরিদর্শনকারী দল।

ঝাড়খণ্ডে আর এস এস-বিজেপির সাম্প্রদায়িক ও দলিত-বিরোধী নৃশংসতা

মুন্না দাস ৮ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টা নাগাদ মোটর সাইকেল করে জামুয়া জেলার তিসরি থানার অন্তর্গত গুমহারিয়াটাঁড়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিছু লোক মোটর সাইকেলে চেপে পিছন থেকে এসে ওকে ঘিরে ধরল, ওর মোটর সাইকেলে লাথি মারল আর মোটর সাইকেলে বাঁধা থলিগুলোর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে জিগ্যেস করল, ''এগুলোতে কি আছে''? মোটর সাইকেল আর থলিগুলো মাটিতে পড়ে গেল, আর সেই ধাক্কায় মুন্না দাসও মাটিতে পড়ে গেলেন।

ওদের প্রশ্নের উত্তরে মুন্না দাস বললেন, থলিগুলোতে রয়েছে মোষ, ষাঁড় আর ছাগলের চামড়া। ঐ লোকগুলোর মধ্যে কেউ কেউ ''গো মাতাকি জয়'' বলে চেঁচিয়ে উঠে ওকে ঘুঁষি, লাথি মারতে লাগল। ওদের মারের চোটে ওঁর নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। মুন্না দাস ওদের বোঝানোর চেষ্ট করলেন যে—ও একজন দলিত, মরা গোরু-মোষের চামরার ব্যবসা করে আর সেটা ওর বংশগত ব্যবসা। আক্রমণকারীদের একজন বলল যে, ওর জামা-প্যান্ট খুলে দেখ ও সত্যি কথা বলছে কিনা (অর্থাৎ, ওর সুন্নৎ করা হয়েছে কিনা এবং ফলে ও মুসলিম কি না)। মুন্না দাসকে নগ্ন হয়ে 'প্রমাণ করতে হয়' যে ও মুসলিম নয়। একটু পরে ওরা ওকে আবার মারতে শুরু করে এবং আবারও নগ্ন করে, আর এর সাথেই হুমকি দেয় যে, থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে এই আক্রমণের কথা জানালে ফল ভালো হবে না।

দলিতদের ওপর কি ধরণের নির্মমতা চালানো হয় এই ঘটনা তার এক জ্বলন্ত নিদর্শন—নগ্ন করে অবমাননার মুখে ফেলা হল দলিত উৎপীড়নের এক অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত। এই ঘটনার কিন্তু একটা সাম্প্রদায়িক দিকও ছিল। আর এস এস-বিজেপি ক্যাডারদের কোন লোককে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে নগ্ন করে এটা 'পরখ' করার অধিকার থাকে যে সে মুসলিম কি না, আর তার জন্য পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় না—এটা ভারতীয় গণতন্ত্রের কদর্য চেহারার অকাট্য নিদর্শন।

এই ঘটনা জানার পর সি পি আই (এম এল) নেতৃবৃন্দ তিসরি থানায় এফ আই আর দায়ের করতে যায়, কিন্তু থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ এফ আই আর নিতে অস্বীকার করেন। উল্টে তিনি মুন্না দাসকে ধমকাতে থাকেন এবং ওকে একটা দরখাস্ত দেখান যাতে আর এস এস এবং বজরং দল ওকে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে। থানার কনস্টেবল স্পষ্টতই আর এস এস-এর পক্ষে দাঁড়িয়ে মুন্না দাসকে বেআইনি কাজের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন।

বিজেপি গুণ্ডাদের গরু-ষাঁড় সম্পর্কে সত্যিই যদি কোন দয়া থাকে তবে ওদের উচিৎ গবাদি পশু লালন পালনের জন্য চাষীদের অতিরিক্ত ভাতা দেওয়ার পক্ষে আন্দোলন করা। গো-রক্ষার নামে গুণ্ডাগিরি করা হল দলিতদের সন্ত্রস্ত করে তোলা ও তাদের ওপর আক্রমণ চালানোর একটা কৌশল মাত্র। বেশিরভাগ স্থানেই আজও চিরাচরিৎ পদ্ধতিতে মরা গবাদি পশুর সাফাই হয়, আর না হলে তারা পচতে থাকে। মুন্না দাস আর তার মত হাজার হাজার মানুষকে জঘন্য পরিস্থিতিতে এই কাজ করতে হয়, আর এই পরিস্থিতির জন্য দায়ি হল সরকারগুলো যারা এই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক সাম্প্রদায়িক গুণ্ডাদের সমর্থনে পুষ্ট। যারা 'গোরক্ষা' বলে চিৎকার করছে তাদের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানো ছাড়া অন্য কোন লক্ষ্য নেই। ওদের এবং ওদের দলগুলোর দলিত, চাষী বা গবাদি পশুর কল্যাণের কোন আগ্রহই নেই।

এটা এই জেলা বা এই রাজ্যের কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর আগে জামুয়া জেলার গাওঁয়া ব্লকে বিজেপির লোকজন 'গো রক্ষা'-র নামে মানুষদের মারধোর করেছে। রামগড় ও নিরসায় ওরা গবাদি পশু বোঝাই লরিগুলোকে থামিয়ে গণ্ডগোল বাধানো ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ওদের হাতে আক্রান্তরা অত্যন্ত দরিদ্র মানুষ, আর সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে দলিতরাই এই কাজগুলো করে থাকে। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর পাশাপাশি বিজেপি এই বিষয়টাকে ধরে দরিদ্রদের বিরুদ্ধে সামাজিক মেরুকরণ ঘটানোরও চেষ্টা করছে। যে সমস্ত চাষী আর কাজে লাগে না এমন গবাদি পশু বিক্রি করতে চান তারা বিজেপির এই ফন্দিতে হেনস্থার শিকার হচ্ছে। লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে বিজেপি প্রার্থী রবীন্দ্র রাই ও গোটা সংঘ পরিবার বিরনি ব্লকে রামনবমি যাত্রার পথকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা উসকিয়ে তুলে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চেয়েছিল।

সাম্প্রদায়িক-সামাজিক মেরুকরণের মদতকারী দ্বিতীয় স্তম্ভটা হল আদিবাসী-বিরোধী মেরুকরণ। আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত সমস্ত আসনে বিজয়ী হওয়ার লক্ষ্যে বিজেপি শক্তিশালী আদিবাসী-বিরোধী মেরুকরণ ঘটাতে গোটা ঝাড়খণ্ডেই রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। সুচতুরভাবে ওরা 'খ্রিষ্টান আদিবাসী বনাম সারনা আদিবাসী'র ইস্যু তুলে আদিবাসীদের সামাজিক ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে বড়দিনের সময় ওরা রাঁচিতে 'সারনা আদিবাসী'র পোষাকে সজ্জিত মেরির মূর্তির ইস্যুকে তুলে ধরে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়াতে সফল হয়েছিল। একইভাবে জুলাই মাসে ঈদের সময় সংঘ পরিবার একটি জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে তাতে সাম্প্রদায়িক রং চড়িয়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদ উসকিয়ে তুলেছিল। মহিলা ক্রীড়াবিদ তারা সাহাদেও যে প্রতারণা ও পারিবারিক হিংসার মুখোমুখি হয়েছিলেন তাকে ধরে 'লাভ জেহাদ' নিয়ে কদর্য প্রচার চালিয়ে ওরা মোদী সরকারের বিরুদ্ধে নারী ও যুবকদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা চালিয়েছিল।

শাসকশ্রেণীর সমস্ত দলগুলোই এই সব জাতপাত-সাম্প্রদায়িক ইস্যুগুলোতে বিজেপির কাছে নতিস্বীকার করে। মুন্না দাসের ওপর আর এস এস-বিজেপি যে নৃশংস আক্রমণ হেনেছে তা নিয়ে জে ভি এম, জে এম এম এবং কংগ্রেস মুখে কুলুপ এঁটে আছে। নির্মম আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে গোটা সরকারি যন্ত্রটাই মুন্না দাস ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে মর্যাদা ও ন্যায় বিচারকে সুনিশ্চিত করতে অস্বীকার করছে। সি পি আই (এম এল) বিজেপির এই সাম্প্রদায়িক কৌশলকে উন্মোচিত করেছে এবং গিরিডিতে ধর্ণা ও জেলার বেশ কয়েকটি ব্লকে প্রতিবাদ সংগঠিত করেছে। সি পি আই (এম এল)-এর উদ্যোগ এই জেলায় বিজেপিকে রক্ষণাত্মক অবস্থানে ঠেলে দিয়েছে। **- মনোজ ভক্ত**

লিবারেশন, অক্টোবর ২০১৪

বিপ্লবী বামপন্থার বার্তাবহ
আজকের দেশব্রতী পড়ুন

''আজকের দেশব্রতী'' সম্পাদকমণ্ডলী
অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী,
জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত,
সৌভিক ঘোষাল ও কল্যাণ গোস্বামী

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত
ইংরাজী সাপ্তাহিক ''আপডেট''
গ্রাহক মূল্য ঃ ৫০ টাকা

পশ্চিমবঙ্গে গৈরিক উত্থান—নতুন এক চ্যালেঞ্জ

বিগত কয়েক বছর ধরে এ রাজ্যে বিজেপির নাটকীয় উত্থান রীতিমতো আলাপ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি বর্ধমানকাণ্ড, একের পর এক বিস্ফোরক বানানো ডেরার হদিশ এবং কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় তৃণমূল ও প্রশাসনের প্রশ্ন জাগানো অবস্থান বিজেপির কাছে যেন আজ শাপে বর। কয়েক মাস আগে দেশের নানা প্রান্তে উপ নির্বাচনগুলোর ফলাফল বুঝিয়ে দিল যে বহু চর্চিত মোদী ঝড় কিছুটা স্তিমিত, বিজেপির দিক থেকে মানুষ যেন আবার মুখ ফিরিয়ে নেওয়া শুরু করেছে। কিন্তু তার মধ্যে এ রাজ্যে উপনির্বাচনের দুটি আসনের মধ্যে বিজেপি একটিতে জয় ছিনিয়ে নিল, আর অপরটিতে দখল করল দ্বিতীয় স্থান। **রাজ্যের মানুষ অবাক হয়ে দেখলেন যে এই প্রথম, ৩৪ বছর বামফ্রন্টের নিরবচ্ছিন্ন শাসনের অবসানে উল্লিখিত শেষোক্ত আসনটিতে সি পি এমের জামানত জব্দ হল।** রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূলের বিরুদ্ধে এখন বামেরা নয়, বিজেপি মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সামনে উঠে রাজ্য রাজনীতিতে গৈরিকায়ন আমদানি করেছে। উদ্বেগের বিষয় হল, এই নতুন মেরুকরণে বামপন্থীরা ক্রমেই পেছনে সরে যাচ্ছে, কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। তৃণমূলের সীমাহীন জনবিরোধী, অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী লুম্পেনসর্বস্ব রাজনীতির বিরুদ্ধে যেন এক স্বাভাবিক পছন্দ হয়ে সামনে আসছে বিজেপি।

বিজেপির উত্থান—এক নজরে

২০১২ ও জুলাই ২০১৪-র মধ্যে সারা দেশজুড়ে আর এস এস-র শাখা সংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে ১৩ শতাংশ! আর সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, জাতীয় হারের তুলনায় তিনগুণ বেশি বৃদ্ধি আর এস এস-এর হয়েছে পশ্চিমবাংলায়। উল্লিখিত পর্যায়ে এ রাজ্যে আর এস এস-এর শাখা সংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে ৩৮ শতাংশ হারে।

গত দুবছরে দক্ষিণবঙ্গ জোনে, আর এস এস-এর শাখা সংখ্যা ৮৪০ থেকে বেড়ে হয়েছে ১,০৫০। পাশাপাশি হু হু করে বেড়ে চলেছে আর এস এস-এর 'সম্মেলন'গুলো। দক্ষিণবঙ্গে সাপ্তাহিক সম্মেলনগুলোর সংখ্যা কয়েক শ থেকে বেড়ে পাঁচ শতাধিকের বেশি হয়েছে আর গ্রামে গ্রামে আর এস এস স্বেচ্ছাসেবকদের মাসিক বৈঠক বা 'সংঘ মণ্ডলি'র সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়ে হয়েছে ১,২০০—মাত্র দু বছরের ব্যবধানে। শুধু দক্ষিণবঙ্গেই নয়, উত্তরের জেলাগুলোতে, মুর্শিদাবাদ থেকে ভূটান বর্ডার পর্যন্ত, এমনকি সিকিমেও তারা ছড়িয়ে পড়ছে। (সূত্র ঃ দ্য হিন্দু, ১০ অক্টোবর ২০১৪)

পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারে আর এস এস অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে তার উত্থান ঘটিয়েছে। আর এস এসের উত্থানের অপর পিঠেই রয়েছে বিজেপির রাজনৈতিক আধিপত্য। নীতিশ কুমার নেতৃত্বাধীন জে ডি ইউ-বিজেপি সরকার যখন ২০০৫ সালে ক্ষমতায় আসে, তখন সেখানে প্রায় ৬০০টি আর এস এসের শাখা ছিল। আর ফি বছর ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি ঘটিয়ে বিহার রাজ্যে তৃণমূল স্তরে এখন শাখার সংখ্যা ১৫০০। প্রয়োজনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে যুবকদের অধিক সংখ্যায় সামিল করানোর জন্য আর এস এস তার সংগঠনের বেশ কিছু নিয়মবিধিও শিথিল করেছে।

সংঘ পরিবারের তিনটি বহু চর্চিত সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল এবং এ বি ভি পি ছাড়াও রয়েছে তৃণমূলস্তরে নানা ধরণের সংগঠন, সমিতি বা সংঘ; যেগুলো বছরভর গ্রাম-গ্রামান্তরে, পঞ্চায়েত স্তরে, এলাকায় কাজ করে। **বিজেপির পক্ষে এই সমস্ত সংগঠনগুলোই নির্বাচনের সময় মেশিনারি হিসাবে ভোট সংগঠিত করে থাকে।** এগুলো হল, বিদ্যাভারতী, কিষাণ সংঘ, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, সেবা ভারতী, শাখা, ভারত বিকাশ পরিষদ, আরোগ্য ভারতী বা বিশ্ব আয়ুর্বেদ সংগঠন। আর এস এসের এক কর্মকর্তার বক্তব্য অনুযায়ী, শিক্ষা-স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে নীচুতলায় সাধারণ মানুষের আশু সমস্যা নিরসনে এরকম একগুচ্ছ সংগঠনের মাধ্যমে আর এস এসের 'প্রচারকেরা' সারা বছর নীরবে কাজ করে থাকে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের দিকে চোখ ফেরানো যাক। গত ৬ মাসে বিশেষ করে লোকসভা নির্বাচনের পর এ রাজ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিজেপির সদস্য সংগ্রহ লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। **২০১৩-র ডিসেম্বর পর্যন্ত এ রাজ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিজেপির সদস্য সংখ্যার হার ছিল ৬.০৬ শতাংশ। আর মাত্র ৬ মাসে ২০ জুন ২০১৪-র মধ্যে তা বেড়ে হয়েছে ১২.৩৪ শতাংশ।** (সূত্র ঃ দ্য হিন্দু, ৬ আগস্ট ২০১৪)। এর মধ্যে বেশীরভাগ মানুষই বিজেপিতে যোগ দিয়েছে লোকসভা নির্বাচনের পরে। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, এ রাজ্যে ২০১০ পর্যন্ত বিজেপির সদস্য সংখ্যা ছিল ৯০,০০০; আর বর্তমানে তা লাফিয়ে বেড়েছে প্রায় ৬ লক্ষে! তাদের আরও দাবি, সি পি এম, ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে দলে দলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ বিজেপিতে যোগ দিচ্ছে। আর 'ভিন্ন' মতাদর্শ থেকে যোগ দেওয়ার জন্য বিজেপি এখন তাদের 'মতাদর্শ' শিক্ষায় শিক্ষিত করতে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির সংগঠিত করছে।

তপসিলি জাতি-উপজাতি-ওবিসি-র প্রতি বিশেষ নজর

বিহারে দলিত, মহাদলিত, তপসিলি জাতি-উপজাতি বা ওবিসি-র ওপর বিশেষ নজর দিয়ে বিজেপি নির্বাচনী সাফল্য পেয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এ রাজ্যেও তারা এই বিরাট সংখ্যক সামাজিক গোষ্ঠীকে সংগঠিত করতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এ জন্য আর এস এস বেছে নিয়েছে দুই ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়ার গ্রামীণ অঞ্চল ও বীরভূম। **শুধুমাত্র ধর্মীয় আবেগের ভিত্তিতে নয়, এদের পশ্চাদপদ আর্থিক-সামাজিক দাবিগুলোকে সামনে রেখে জড়ো করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।** পাশাপাশি বাংলাদেশী 'অনুপ্রবেশ'-এর ইস্যুটাকেও তুলে ধরা হচ্ছে, কারণ আর এস এসের নিজস্ব সামাজিক অনুসন্ধান অনুযায়ী তারা মনে করছে যে 'অনুপ্রবেশ'-এর ফলে ঐ অংশের মানুষেরাই সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এই রণকৌশল তাদের সফল হতে শুরু করেছে। আর এস এস দাবি করছে যে তাদের ৭০ শতাংশ স্থানীয় নেতাই এই সমস্ত পশ্চাদপদ অংশ থেকে এসেছেন।

দেশব্যাপী বিজেপি বা বিশেষ করে মোদীর উত্থানের ফলে এ রাজ্যে সমাজের উচ্চশিক্ষিত একটা অংশ, প্রাক্তন আমলা ও পুলিশ অফিসার এমনকি দীর্ঘদিন কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নেতা বিজেপিতে ভিড়তে শুরু করেছে। কিন্তু এ রাজ্যে বিজেপির সর্বজনগ্রাহ্য 'মুখ' বা ব্যক্তিত্বের অভাব এখনও একটা বড় দুর্বলতা। আবার, মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন যে হারে বিজেপিতে ঢুকে পড়ছে, তা নিয়ে সাবেক বিজেপি-আর এস এস ক্যাডাররা অসন্তুষ্ট। তারা আশঙ্কা করছেন যে, এর ফলে বিজেপি তার স্বাতন্ত্রতা হারাবে, অন্যান্য তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর মতো বিজেপিও সংখ্যালঘুদের 'তুষ্ট' করতে তোষণ নীতির আশ্রয় নেবে। এনিয়ে, এমনকি সোশ্যাল নেটওয়ার্কে উদ্বেগ, বিরোধীমূলক মন্তব্যও সামনে আসতে শুরু করেছে।

মোকাবিলার পথ কীভাবে?

এ রাজ্যে সংঘ পরিবারের এই উত্থান প্রশ্নাতীতভাবেই ৩৪ বছরের বাম সরকারের সার্বিক দেউলিয়াপনার এক প্রামাণ্য দলিল! ৩৪ বছর বাম সরকার শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিল তো বটেই, উপরন্তু এ রাজ্যে পঞ্চায়েত, পৌরসভা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র—অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে সামাজিক-নাগরিক-বৌদ্ধিক জগতেও বাম সরকার কায়েম করেছিল তার নিরবচ্ছিন্ন একচ্ছত্র আধিপত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বাম সরকারের পতন এবং তৃণমূলের ৩ বছর শাসনের স্বল্প ব্যবধানের মধ্যেই ঘটে গেল বিজেপির অকল্পনীয় উত্থান—এ রাজ্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে যে দলটির কোনকালেই ছিল না বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ও সংযোগ। রাজনীতির বৃহত্তর আঙ্গিনায়, সাম্প্রদায়িক শক্তিকে ঠেকাতে ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক নির্বাচনী জোট গঠনের নামে চরম সংকীর্ণ সংসদীয় স্বার্থে শুধুমাত্র কিছু আসন জেতার সর্বনাশা বাম কৌশল এর জন্য অবশ্যই দায়ী। আবার, বামফ্রন্টকে ক্ষমতা থেকে সরাতে তৃণমূলের মত দক্ষিণপন্থী শক্তির সঙ্গে এ রাজ্যে বেশ কিছু বামেদের রাজনৈতিক সাহচর্য বাম আন্দোলনে চরম ক্ষতি করেছে। **বৃহত্তর বাম আন্দোলনের অভ্যন্তরে, একই সুবিধাবাদী মতাদর্শ দুই বিপরীত মেরুতে দুভাবে আত্মপ্রকাশ করে।** বামপন্থার স্বাধীন স্বতন্ত্র আত্মপ্রকাশের এজেণ্ডাকে জলাঞ্জলি দেওয়ার ফলে তৃণমূলের মত স্বৈরাচারী, বিজেপির মত কর্পোরেট সাম্প্রদায়িক শক্তি মাথাচাড়া দেওয়ার উর্বর জমি ফিরে পেল দীর্ঘ বাম আন্দোলনের ঐতিহ্যসম্পন্ন এই বাংলায়। ক্ষমতাসীন বামপন্থীদের শত-সহস্র গণসদস্য বিশিষ্ট গণসংগঠনগুলো মতাদর্শগতভাবে এতটাই নিরস্ত্র, অরক্ষিত হয়ে ওঠে যে ঘরের বাইরে প্রবল প্রতাপে ফুটে ওঠা সার সার পদ্মফুলের কোন হদিশই খুঁজে পেল না। পেলেও তার প্রতিকার, প্রতিরোধের জন্য গড়ে তুলতে পারল না কার্যকরী মতাদর্শগত-রাজনৈতিক ব্যারিকেড। তৃণমূলের আক্রমণের মুখে বিজেপিতে সদলবলে যোগদান এই বৃত্তকেই সম্পূর্ণ করল।

অন্যান্য পরিচিতি ভিত্তিক (আইডেন্টিটি) পার্টিগুলোর সঙ্গে বিজেপির সবচেয়ে বড় তফাত যে বামপন্থী দলগুলোর মতই এটাও এক ক্যাডার ভিত্তিক দল। সংগঠনের নানা রূপ ও কাঠামো গড়ে তুলে একেবারে তৃণমূল স্তরে সংঘ পরিবার কাজ করে চলেছে অনেকটা নীরবে, অলক্ষ্যে, 'অরাজনৈতিক' আবরণের মাধ্যমে। তাই, তাকে মোকাবিলা করতে হলে বিপ্লবী বামপন্থীদের একেবারে তৃণমূল স্তরে গড়ে তুলতে হবে শ্রেণী, পেশা নির্ভর, সম্প্রদায় ভিত্তিক, কল্যাণকামী নানা রূপের সংগঠন। শুধুমাত্র, বৃহত্তর ক্ষেত্রে বা ম্যাক্রো লেভেলে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রচার করে বিজেপিকে রোখা যাবে না। তপসিলি জাতি-উপজাতি-ওবিসি-র মধ্যে কীভাবে ঢোকা যায়, তার উদ্ভাবনী কৌশলও স্থির করা দরকার।

সংকীর্ণ ভোট সর্বস্ব রাজনীতির উপর ভর করে তৃণমূল সংখ্যালঘু মানুষদের পক্ষে টানতে যে কৌশল, যে রাজনৈতিক আচরণ অবলম্বন করে চলে তার বিপরীতে হিন্দুত্ববাদী ভাবাবেগকে সংহত করার সুযোগ করে দিয়েছে। বাম সরকারকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করতে তৃণমূল সেই সময়ে সমস্ত শক্তি এমনকি মাওবাদীদের সঙ্গেও সখ্যতা বাড়িয়েছিল—তা আজ সকলেরই জানা। এমনই এই দলের মধ্যে কোন কোন নেতার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী যোগাযোগ থাকাও অস্বাভাবিক কিছু নয়। তৃণমূলী রাজ্যসভার সাংসদের দিকে রয়েছে এমনই অভিযোগের তীর। আর বিজেপির কাছে এটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে 'পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা'র মত। এ রাজ্যে সাম্প্রদায়িক জিগিরকে সুকৌশলে তীব্র করার গভীর ষড়যন্ত্র সংঘ পরিবার যে করবে, বর্ধমানকাণ্ড তাতে বাড়তি মাত্রা এনে দিল। তাই তৃণমূলের বিরুদ্ধে, বিজেপিকে মোকাবিলা করার একমাত্র পথ এন আই এ-র ওপর জনগণের মোহবিস্তার নয়, বা ষড়যন্ত্র উন্মোচনে কোন সংস্থা কার্যকরী—সেই বিতর্কে ঢুকে পড়া নয়। সার্বিক বাম রাজনীতির আলোকেই এর মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

- অতনু চক্রবর্তী

... সুব্রত চক্রবর্তী প্রয়াত

একের পাতার পর

পর্যন্ত প্রবল নিষ্ঠা এবং নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এমনকি অতি সম্প্রতি ময়নাগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনের সময় অশক্ত শরীর নিয়েও তিনি অক্লান্ত লড়াই চালিয়ে গেছেন।

কমরেড সুব্রত চক্রবর্তী অসম্ভব গানপাগল মানুষ ছিলেন এবং নিজেও সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন।

তাঁর আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ পেয়ে পার্টির সমস্ত স্তরের নেতা-কর্মী-পার্টি দরদী মানুষেরা শোকস্তব্ধ হয়ে যান। আন্তরিকভাবে শোকপ্রকাশ করেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কার্তিক পাল, রাজ্য সম্পাদক কমরেড পার্থ ঘোষ, রাজ্য স্ট্যাণ্ডিং বডির সদস্য ও প্রয়াত কমরেডের কয়েক দশকের ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা কমরেড বাসুদেব বসু প্রমুখ।

দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু হওয়ায় ময়নাতদন্তের পর প্রয়াত জেলা সম্পাদকের মরদেহ পার্টির জেলা কার্যালয়ের সামনে থেকে সুসজ্জিত শোক মিছিল করে তাঁর বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর স্ত্রী, কন্যা, জামাতা, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র সহ পাড়ার বহু মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তারপর তাঁর মরদেহ পার্টি অফিসে ফিরিয়ে এনে যথোচিত মর্যাদায় শায়িত রাখা হয়। মরদেহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সি পি আই (এম) জেলা সম্পাদক কমরেড সলিল আচার্য, সিটুর পক্ষে কমরেড জিয়াউল আলম ও কৃষ্ণ সেন, আর এস পি-র পক্ষে জেলা আহ্বায়ক কমরেড প্রকাশ রায়, এস ইউ সি-র পক্ষে কমরেড অমল রায়, সমাজবাদী জনপরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ চা মজদুর সংগঠনের পক্ষে কমরেড কমল কৃষ্ণ ব্যানার্জী, এ বি পি টি এ-র পক্ষে কমরেড নীলাদ্রী অধিকারী প্রমুখ।

সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড গৌরী দে, পবিত্র সিংহ, অভিজিৎ মজুমদার, চঞ্চল দাস; জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কমরেড সুভাষ দত্ত সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ বিজন সরকার, মাণিক ঘোষ, শ্যামল ভৌমিক, ভাস্কর দত্ত, মুকুল চক্রবর্তী, হবিবর রহমান, অন্নদেব রায়, রবিনাথ রায়, শৈলেন রায়, প্রদীপ গোস্বামী; দার্জিলিং জেলা কমিটির সদস্য কমরেড পুলক গাঙ্গুলী, মোজাম্মেল হক, অপু চতুর্বেদী, নিমু সিংহ, শরৎ সিংহ, লালু ওঁরাও, মুক্তি সরকার, অনীক চক্রবর্তী প্রমুখ। এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে কমরেড সুব্রত চক্রবর্তীর দীর্ঘ কমিউনিস্ট জীবনের ওপর আলোকপাত করেন সুভাষ দত্ত ও অভিজিৎ মজুমদার। অন্তিম শ্রদ্ধা জানিয়ে মরদেহ নিয়ে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে মিছিল এগিয়ে চলে স্থানীয় মাসকলাইবাড়ি শ্মশানের উদ্দেশ্যে। সেখানেই কমরেড সুব্রত চক্রবর্তীর শেষকৃত্য সম্পাদিত হয়।

কলকাতায় পার্টির রাজ্য অফিসে উপস্থিত রাজ্য কমিটির সদস্যবৃন্দ ও অন্যান্য কমরেডরা কমরেড সুব্রত চক্রবর্তীর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পার্টির পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

কমরেড সুব্রত চক্রবর্তী লাল সেলাম!

মহিলারা রাতের শিফটে কাজ করতে পারেন
কিন্তু সরকার ফ্যাক্টরিতে মহিলাদের সমানতা ও নিরাপত্তা কবে সুনিশ্চিত করতে পারবে?

আধুনিক শিল্প ... বহুজাতিক কর্পোরেশন ... নোকিয়া কোম্পানিতে কর্মরত ... সম্মানজনক কাজ ... বিবাহের বাজারে অতিশয় দামি ... এমনই এক নোকিয়ার কর্মী ২২ বছরের অম্বিকা ২০১০ সালের ৩১ অক্টোবর দ্বিতীয় শিফ্‌টে কর্মরত অবস্থায় মারা যান। তিনি যখন মেশিনের একটা কোন সমস্যা ঠিকঠাক করার কাজ করছিলেন তখন মেশিনের মধ্যে তাঁর মাথা আটকে যায়। শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে তাঁকে মেশিনের ভেতর থেকে বের করে আনার চেষ্টা করে। যখন তা করা খুবই মুশকিল হওয়ায় তারা মেশিন ভাঙার চেষ্টা করে। নোকিয়া কর্তৃপক্ষ, যারা মেশিন যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার জন্য খুবই সতর্ক ও চিন্তিত ছিল, তারা তখন এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে এবং বলে যে মেশিন খুবই দামি তাই একে ভাঙ্গা যাবে না। এর মধ্যে কর্মীরা অম্বিকাকে মেশিনের ভেতর থেকে বের করে আনতে যখন সক্ষম হন তখন সে মৃত। প্রকৃতপক্ষে তিনি ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকেই ঢলে পড়ছিলেন, তাঁর নাক-মুখ থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছিল সহকর্মীদের চোখের সামনেই এবং তারা অসহায়ভাবে তা প্রত্যক্ষ করছিল। কর্তৃপক্ষ একজন টেকনিশিনয়ানের সাহায্যে তাড়াতাড়ি মেশিনটা সারাই করে ফেলল, মেশিনের গা থেকে অম্বিকার রক্ত ধুয়ে মুছে ফেলল এবং পরেরদিন শ্রমিকরা প্রতিবাদ-বিক্ষোভ জানাতে পারে অনুমান করে ছুটি ঘোষণা করে দিয়ে তার পরদিন মেশিন নিয়মিতভাবে চালু করে দিল।

মহিলাদের রাতের শিফ্‌টে কাজ করার ব্যাপারটা আইনসিদ্ধ করার জন্য ফ্যাক্টরি আইন সংশোধন করতে গিয়ে মোদী সরকার দাবি করে যে মহিলাদের প্রতি বৈষম্য দূর করা ও তাদের সমান অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে এটা এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। নিঃসন্দেহে, যে আইন মহিলাদের রাতের শিফ্‌টে কাজ করা নিষিদ্ধ করে তা অনুগ্রহকারি ও পিতৃতান্ত্রিক।

রাতের শিফ্‌টে মহিলাদের কাজ করার ব্যাপারটা মহিলাদের নিরাপত্তার পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিরোধিতা করা যায় না। সর্বোপরি, এদেশে মহিলারা দিনের কোন সময়েই নিরাপদ নন এবং মহিলারা দিনের বেলাতেও যৌন হেনস্থা ও ফ্যাক্টরিতে অনিরাপদ কাজের পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে। দিনের বেলায় হোক বা রাতের শিফ্‌ট হোক, মহিলা কর্মীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব তাদের নিয়োগকর্তা এবং সরকারের। প্রশ্ন হল, সেই নিরপত্তা সুনিশ্চিত করতে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে?

মহিলা কর্মীদের রাতের শিফ্‌টে কাজ করতে অনুমোদন দেওয়ার জন্য ফ্যাক্টরি আইনের সংশোধনের বর্তমান উদ্যোগের আগেও বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। একদিক থেকে আমরা বলতে পারি যে এ ব্যাপারে তামিলনাড়ু সরকার হল 'অগ্রদূত'।

১৯৯০ সালে গৃহীত আই এল ও প্রোটোকল ৮৯-এ উপযুক্ত সরকারকে মহিলারা যাতে রাতের শিফ্‌টে কাজে আসতে পারেন সেইমত আইন সংশোধনের অনুমোদন দেয়, যাকে ভারত সরকার ২০০৩ সালে বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন অনুমোদন দিয়েছিল। ঐ বছরের জুলাই মাসে এ ব্যাপারটাকে সহজসাধ্য করতে ফ্যাক্টরিস্ অ্যাক্ট (সংশোধনী) বিল ২০০৩ লোকসভায় পেশ করা হয়েছিল। একই সংশোধনী সহ ইউ পি এ-১ সরকারও ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট (সংশোধনী) বিল ২০০৫ লোকসভায় পেশ করে। এই সংশোধনী মহিলা কর্মীদের তাদের 'বাড়ির দরজা'-য় এনে ফেরত দেওয়ার অনুমোদন দিল না, বলল তাদের নামিয়ে দেওয়া হবে কেবলমাত্র 'কাছাকাছি' একটা নির্দিষ্ট জায়গায়। মহিলারা তখন তার বিরোধিতা করেন এই বলে যে, রাতে অন্ধকার রাস্তা—তাই তাদের বাড়ির সামনেই নামিয়ে দিতে হবে।

তামিলনাড়ুতে, তিরুপুরে বিভিন্ন ফ্যাক্টরি শ্রমিকদের অ্যাসোসিয়েশনগুলো ফ্যাক্টরি আইন ১৯৪৮-এর ৬৬ ধারার ওপর মাদ্রাজ হাইকোর্ট থেকে এক অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ নিয়ে আসে। সেই থেকে তিরুপুরে পোষাক ফ্যাক্টরিগুলোতে মহিলারা নাইট শিফ্‌টে কাজ করছেন। মাদ্রাজ হাইকোর্টের ২০০০ সালের ৮ ডিসেম্বর এক আদেশে বলা হয় যে ৬৬ (১)(বি) ধারা যা মলিাদের রাতের শিফ্‌টে কাজ করা নিষিদ্ধ করে তা সংবিধানের ১৪, ১৫ এবং ২১ নং ধারা লঙ্ঘন করছে। কেবল সেইসব ইউনিটগুলোকে ছাড় দেওয়া হবে যারা মামলায় লড়েছে। তবে কোর্ট বিধান দেয় যে ফ্যাক্টরিগুলো বিশেষ অনুমতির জন্য আবেদন করতে পারে যা আবার প্রত্যেক বছর নবীকরণ সাপেক্ষ এবং তারপর তারা রাতের শিফ্‌টে মহিলাদের কাজের ব্যবস্থা চালু করতে পারে। তামিলনাড়ু সরকার ঘোষণা করে যে তারা এই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করবে। কিন্তু পাঞ্জাব সরকারের চীফ সেক্রেটারি ২০১০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি এক চিঠিতে তামিলনাড়ু চীফ ইনস্পেক্টর অফ ফ্যাক্টরি জানায় যে তামিলনাড়ুর কোন আদালতেই ঐ ধরণের কোন আপীল মুলতুবী নেই। তার মানে হল তামিলনাড়ু সরকার তার আপীল আর চালিয়ে যায়নি।

এইভাবে ১৯৯৭ সালের অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ এবং ২০০০ সালের বিশেষ অনুমতি তামিলনাড়ুতে মহিলা শ্রমিকদের রাতের শিফ্‌টে কাজ করার পক্ষে যথেষ্ট আইনি সুযোগ এনে দিয়েছে। নোকিয়া (সেজ) বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে নোকিয়া ও তার সহযোগী সংস্থাগুলো বিশেষ অনুমতি নিয়ে মহিলাদের রাতের শিফ্‌টে কাজে নিয়োগ করে। তিরুপুরে পোষাক শিল্পে মহিলা শ্রমিকরা দুই শিফ্‌টে কাজ করেন—একটি সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এবং অপরটি রাত ৯টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত। অর্থাৎ ১২ ঘন্টা ও ৯ ঘন্টা যা আবার ৮ ঘন্টা কর্মদিবসের লঙ্ঘন। কোনো বর্তমান শ্রম আইন এই লঙ্ঘনকে নিয়ন্ত্রণ করেনি। মাদ্রাজ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনে ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট ফ্যাক্টরি ও পোশাক ফ্যাক্টরিগুলো রাতের শিফ্‌টে মহিলাদের নিয়োগ করছে। কোয়েম্বাটোরে হীরে কাটার কারখানা ও পোশাক কারখানাগুলোতে মহিলাদের দুই শিফ্‌টে কাজ করায়—সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা।

২০১৪ সালের ২২ জানুয়ারি তামিলনাড়ু সরকার ফ্যাক্টরি আইন ১৯৪৮-কে সংশোধন করেছে। তাতে এক নতুন ধারা ৮৪বি যুক্ত করা হয়েছে যাতে মহিলাদের রাতের শিফ্‌টে কাজ করাতে হলে ১৪টি শর্ত পালন করতে হবে। তামিলনাড়ু সরকারের ২০১৪ সালে তৈরী অটোমোবাইল ও অটো কম্পোনেন্টস্ পলিসি ঘোষণা করার সময় ফেব্রুয়ারী মাসে জয়ললিতা বলেন যে, তামিলনাড়ু সরকার রাতের শিফ্‌টে মহিলাদের নিয়ে আসার বিষয়ে বিবেচনা করছে।

২০১৩ সালে গুজরাত হাইকোর্ট রায় দেয় যে ধারা ৬৬ (১)(বি) যা মহিলাদের রাতের শিফ্‌টে কাজ নিষিদ্ধ করেছে তা সংবিধানের ১৪, ১৫ ও ১৬ ধারাকে লঙ্ঘন করেছে।

পাঞ্জাব সরকার ২০০০ সালের মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায় উদ্ধৃত করে বলে যে, ঐ আইন হুবহু পাঞ্জাবে লাগু করা যাবে না। কিন্তু মাদ্রাজের উদাহরণ টেনে ২০১০-এর অক্টোবরে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে মহিলাদের রাতের শিফ্‌টে কাজের বিজ্ঞপ্তি জারি করে। ২০১৩-র ১৩ নভেম্বর এক সরকারি আদেশ বলে মাদ্রাজ হাইকোর্টের ২০০০ সলের রায়ের ধাঁচে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী নির্দিষ্ট করে।

১৯৯৯-এর ১০ জুন এক রায়ে মুম্বাই হাইকোর্ট মহিলাদের রাতের শিফ্‌টে নিয়োগের অনুমোদন দেয়। অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টও ৬৬ ধারাকে অবৈধ বলে রায় দিয়েছে।

যখন আই টি সেক্টরে রাতের শিফ্‌ট এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠল তখন ২০০৭ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের ও কর্ণাটক সরকার তাদের নিজ নিজ রাজ্যের দোকান ও অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আইনের সংশোধন করে রাতের শিফ্‌টে মহিলাদের নিয়োগ নিশ্চিত করে।

ওপরে উল্লেখিত দৃষ্টান্তগুলো থেকে এটা পরিষ্কার যে, সমস্ত ব্যবহারিক প্রয়োজনের স্বার্থে ফ্যাক্টরি আইনের ৬৬ (১)(বি) ধারাকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে কখনও অনুমোদন দেওয়ার মাধ্যমে, কখনও বিজ্ঞপ্তি জারি করে, আবার কখনও বাতিল করে দিয়ে। আর মহিলাদের যেখানে যখন যেমন প্রয়োজন রাতের শিফ্‌টে কাজ করানো হচ্ছে। আই টি সেক্টরের কাজ সহ এই সমস্ত কাজকর্ম যা 'হোয়াইট কলার' বলে মনে করা হয়, তাতে জুড়ে রয়েছে একঘেয়েমি। পোশাক এবং ইলেক্ট্রনিক ক্ষেত্রগুলো শ্রম নিবিড়। সেখানে সাধারণভাবে দিনের বেলায় বেশী সংখ্যায় মহিলা শ্রমিক নিয়োগ করা হয়ে থাকে। কিন্তু রাতে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এখন তারাও চাইছে আইনসিদ্ধভাবে রাতের শিফ্‌টে মহিলা শ্রমিক নিয়োগ করতে। কারণ একই কাজের জন্য পুরুষের তুলনায় মহিলাদের কম মজুরি দেওয়া হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলো উভয়ই যারা রাতের শিফ্‌টে মহিলাদের কাজ করার অধিকার নিয়ে গদগদ তারা সম কাজে সম বেতন পাওয়ার মহিলা শ্রমিকদের অধিকারের ব্যাপারে নিশ্চুপ।

মহিলা শ্রমিকদের অধিকারের অবাধ লঙ্ঘন

সরকার রাতের শিফ্‌টে কাজের সময় মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে অনেক রকম শ্রুতিমধুর প্রতিশ্রুতির প্রস্তাব রেখেছে। কিন্তু সেসব কাগজেই থেকে যাচ্ছে। বাস্তব হল শ্রমিক ও মহিলাদের অধিকার রক্ষার জন্য বর্তমানে যে সমস্ত শ্রম আইনগুলো রয়েছে সেগুলো খোলাখুলি, নির্লজ্জভাবে লঙ্ঘন করা হচ্ছে। তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের পোশাক শিল্পের কর্মীরা অভিযোগ জানাচ্ছেন যে অনেক কারখানাতেই কোন শৌচালয়ের ব্যবস্থা নেই। অধিকাংশ কারখানাতেই এমনকি যখন প্রয়োজন শ্রমিকদের শৌচালয় ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। মহিলা শ্রমিকদের ঋতুচক্রের সময় এমনকি যেমন যেমন প্রয়োজন প্যাড বদলের অধিকারও অস্বীকার করা হয়। যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে বিশাখা কমিটির অস্তিত্বই নেই। অধিকাংশ কারখানায় দুর্ঘটনা থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করার জন্য যে প্রাথমিক বিধিবদ্ধ সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকার কথা তাও নেওয়া হয় না। শ্রমিকদের এমকাত্র সুরক্ষা রয়েছে ইউনিয়নে—কিন্তু অধিকাংশ কারখানায় শ্রমিকদের ইউনিয়নভুক্ত হতে বাধা দেওয়া ও ভয় দেখানো হয়।

প্রস্তাবিত সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে মহিলাদের রাতের শিফটে কাজ করাটা ঐচ্ছিক হবে। কিন্তু কিভাবে এটা সুনিশ্চিত করা যাবে যে রাতের শিফটে কাজ করতে অস্বীকার করার জন্য মহিলাদের চাকরি যাবে না? উদাহরণস্বরূপ, বর্তমানে কোয়েম্বাটুরের প্রিকল কারখানায় এ আই সি সি টি ইউ অনুমোদিত ইউনিয়ন যৌথ দর কষাকষি ব্যবস্থার মাধ্যমে মহিলাদের রাতের শিফটে কাজ না করার সিদ্ধান্তকে সুনিশ্চিত করা গিয়েছে এবং মান্যতা পেয়েছে। কিন্তু যেখানে এমনকি ইউনিয়ন করার অধিকারকেই মর্যাদা দেওয়া হয় না সেখানে কিভাবে মহিলাদের পছন্দ করার অধিকারকে সম্মান জানানো হবে ও ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হবে?

তামিলনাড়ুতে সুমখালী প্রকল্পে ১৩ বছরের বালিকার মত ছোট বয়সের মেয়েদের জোর করে দিনে এমনকি ১৬ ঘন্টা খাটানো হচ্ছে। যদি তাদের জন্য রাতের শিফটের অনুমোদন দেওয়া হয় তবে কল্পনা করুন মালিকের হাতে তাদের কি ধরনের কঠিন পরিশ্রম ও অমানুষিক শোষণের সম্মুখীন হতে হবে।

প্রশ্ন হল, কারখানাগুলোতে মহিলাদের বিরুদ্ধে নিয়মানুগ চলমান বৈষম্যের অবসান ঘটানোর জন্য মোদী সরকার ইউনিয়ন ও মহিলা সংগঠনগুলোর সঙ্গে কথা বলেনি কেন? কিভাবে রাতের শিফট মহিলাদের পক্ষে উপযোগী করে তোলা যায় তার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হতে পারত। এছাড়াও অন্যান্য বিষয়গুলো, যেমন সমকাজে সমমজুরি, যথেষ্ট সংখ্যক শৌচালয়ের ব্যবস্থা ও যেসব কাজের পরিস্থিতি মহিলা ও পুরুষ শ্রমিকদের ন্যূনতম স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখে এবং মহিলাদের তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকারক কাজের মধ্যে ঠেলে দেয় তার সমাপ্তি ঘটানোর বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারত।

দাবি করা হচ্ছে মহিলারা 'রাতের শিফট'-এর 'দাবি' করছে। এ্যাসোচেম-এর সহযোগীতায় জাতীয় মহিলা কমিশন রাতের শিফটে কর্মরত মহিলাদের মধ্যে এক সমীক্ষা চালিয়েছিল এবং একটি রিপোর্ট 'রাতের শিফটে মহিলারা ঃ বৃদ্ধি এবং সুযোগ' প্রকাশ করেছিল। ঐ রিপোর্টে একটি পর্যবেক্ষণ হল—৭১.১ শতাংশ মহিলা শ্রমিক রাতের শিফটে কাজের সময় নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করেন না—এই কথাটা সরকারগুলো প্রায়শই উদ্ধৃত করে থাকে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে সমগ্র রিপোর্টের আধারে বিচার করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, রিপোর্টে দেখা গিয়েছে যে বিপিও ক্ষেত্রে ৮ শতাংশের তুলনায় চর্মশিল্পে ৪৫ শতাংশ এবং বস্ত্রশিল্পে ৩৪ শতাংশ মহিলা শ্রমিক রাতের শিফটে নিরাপত্তাহীন বোধ করেন। বিপিও ক্ষেত্রে ১৩.৩ শতাংশ মানসিক হেনস্থার সম্মুখীন হয়—চর্মশিল্প ও বস্ত্রশিল্পের কারখানায় এই হার অনেক বেশি। সেখানে মহিলারা অভিযোগ জানিয়েছেন যে তাদের সারারাত দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়। ৪৫ শতাংশ বলেছেন সর্বদাই ক্লান্ত থাকেন, ৫০ শতাংশ বলেছেন তাদের হজমের সমস্যা, ৬০ শতাংশের অনিদ্রা ও উচ্চ রক্তচাপ, ৫৫ শতাংশের প্রায়শই জ্বর ও সর্দিকাশির সমস্যা, ১০ শতাংশের মানসিক চাপ, ৫০ শতাংশের ঋতুচক্রজনিত সমস্যা এবং ৪৫ শতাংশ সর্বদাই অসুস্থতা বোধ করে। মাত্র ৮.৬ শতাংশ উত্তরদাতাদের কোম্পানীর সীমানার মধ্যেই শিশুদের দেখাশোনার ব্যবস্থা, পরিচর্যাকারী মায়েদের জন্য আলাদা বিশ্রামাগার আছে।

সুতরাং কোন মহিলারা রাতের শিফটে কাজ করে যাচ্ছে। রিপোর্টের পর্যবেক্ষণ হল, বিশেষ করে

সাতের পাতায় দেখুন

মহিলারা রাতের শিফটে কাজ করতে পারেন ...

ছয়ের পাতার পর

চর্ম ও বস্ত্রশিল্প এবং অনুরূপ কারাখানাগুলোর মহিলাদের ক্ষেত্রে, ''সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হল এই যে তাদের জীবিকা নির্ভর করছে কেবল এই উপায়ের ওপর ...। মাত্র ১৬.৮ শতাংশ উত্তরদাতার রাতের শিফটের কাজ করার প্রধান আকর্ষণ হল একটু ভালো বেতন। বাকিদের জবাব হল তাদের আর কোন উপায় নেই। চর্ম ও বস্ত্র কারখানার মহিলা শ্রমিকদের রাতের শিফটে কাজ করতে হয় কারণ এই সমস্ত কারখানায় ব্যবহৃত দামী দামী মেশিনগুলো খুবই দক্ষ, দিনরাত ঐ মেশিনগুলো চালু রাখলে উৎপাদন ও মুনাফা প্রচুর বাড়ে। সুতরাং পরিষ্কারভাবে অধিকাংশ মহিলা শ্রমিকদের, বিশেষত যারা অনেক বেশি নিরুপায় তাদের জন্য রাতের শিফট কোন 'ঐচ্ছিক' বিষয় নয় বরং তাহল 'বাধ্যতামূলক'।

গার্হস্থ্য শ্রমের প্রশ্ন

ফ্লেক্সি ক্যারিয়ার প্রাইভেট লিমিটেডের প্রস্তাব হল মহিলা শ্রমিকদের রাতের শিফটে কাজ করলে নাকি তারা তাদের পারিবারিক দায়দায়িত্ব ভালভাবে পালন করতে পারবে। এই প্রস্তাবের বিষয়ে মতামত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ২০১৪-র ১৭ জুন তামিলনাড়ু শ্রম দপ্তরের একটা চিঠি স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মধ্যে প্রচার করা হয়, এটা এক অদ্ভুত ভণ্ডামিপূর্ণ যুক্তি। কিন্তু টিভিতে জনৈক বিজেপি মুখপাত্র একই যুক্তি হাজির করেছেন। সেই মহিলার বক্তব্য ছিল মহিলারা রাতের শিফটে কাজ করতে চায় তার কারণ তাহলে তারা দিনের বেলা তাদের সন্তানদের সঙ্গে কাটাতে পারে, আর বিকালের দিকে একটু ঘুমিয়েও নিতে পারে। মহিলাদের কাছে ''বাচ্চাদের সাথে সময় কাটানো''র অর্থ হল দিনভর রান্নাবান্না এবং সন্তান পালন করা—অর্থাৎ এক রাতের শিফটের পর আর একটি সমস্ত দিনের শিফট।

রাষ্ট্রীয় মহিলা কমিশনের রিপোর্ট বস্তুত এই দাবির ঠিক বিপরীতটাই লক্ষ্য করেছে। তাতে বলা হয়েছে, ''আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিবাহিত মহিলারা রাতের শিফটে কাজ করতে কিছুটা অসুবিধা অনুভব করেন তাদের পারিবারিক ও প্রজনন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত চাহিদার কারণে।

অধিকাংশ মহিলা শ্রমিক প্রকৃতপক্ষে ''দুই শিফট''-এর কাজ করে থাকেন। কারণ তাদের ওপর রয়েছে 'গার্হস্থ্য শ্রম'-এর বোঝা, যাকে সরকার ''পারিবারিক দায়দায়িত্ব'' বলে গৌরাবান্বিত ও ন্যায্যতা দান করছে। অনেক মহিলা যে রাতের শিফটে বাধ্যতামূলক কাজ করতে চান না তার যথাযথ কারণ এটাই। 'একটা পুরো রাতের ঘুম'-এর বিনিময়ে বিকালে একটু 'গড়িয়ে নেওয়ার' মাধ্যমে মহিলাদের 'ক্ষমতায়ন' করা যাবে এই যুক্তি একেবারেই হাস্যকর। কারখানা এবং অন্যান্য কর্মস্থলগুলোতে শিশুপরিচর্যা ব্যবস্থা এবং শ্রমিক ও তাদের পরিবারগুলোর জন্য সুসম ও সুলভ খাবারের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করতে হবে। এই ধরনের ব্যবস্থাপনা না থাকলে মহিলাদের 'দুই শিফট' কখনই শেষ হবে না এবং রাতের শিফট অসহ্য হয়ে উঠবে।

রাষ্ট্রীয় মহিলা কমিশনের রিপোর্টের এই অংশটি স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে যে রাতের শিফ্‌টে কাজ করতে আসা মহিলা শ্রমিকদের না কোন 'বৃদ্ধি' না কোন সুযোগ সুবিধা হয়েছে। এটা বস্তুত মহিলাদের ওপর আরও একটি অগ্নিপরীক্ষা যারা আগে থেকেই ঘরে মজুরিবিহীন কাজের বোঝা টেনে চলেছে। এটা প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক জৈব ঘড়িকে বিঘ্নিত করে, আর তাই রাতের শিফ্‌ট মহিলাদের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক এবং পুরুষদের ক্ষেত্রেও। বাস্তবে যদি আদৌ মহিলাদের একাংশ রাতের শিফ্‌ট দাবি করেন তবে তা নেহাতই কিছু বেশি অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনে, নিজেদের ভালো বা ক্ষমতায়নের জন্য নয়।

শ্রম দিবস নিয়ে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে দড়ি টানাটানি

রাতের শিফ্‌টের প্রশ্নটি ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করাটা গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের একসাথে করে শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলন 'কাজের দিন'-এর সময়কে নির্দিষ্ট করার জন্য লড়াই চালিয়েছে, আর পুঁজিপতিরা 'কাজের দিন'কে বাড়িয়ে বাড়িয়ে রাত পর্যন্ত এমনকি স্নানাহারের সময়টুকু পর্যন্ত গ্রাস করে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে। কার্ল মার্কস পুঁজি-১ নং খণ্ড, অধ্যায় ১০-এ শ্রম দিবস প্রসঙ্গে পুঁজি ও শ্রমের মধ্যকার সংগ্রাম সম্পর্কে ঐতিহাসিক বর্ণনা সহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

১৯ শতকের ইংলণ্ডে শ্রমিকদের শ্রম থেকে আরও বেশি বেশি উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ করার জন্য রাতের শিফ্‌ট প্রথা চালু হয়। ১৬ বছর বয়সী শিক্ষানবিশদের পর্যায়ক্রমে দিন ও রাতের শিফ্‌টে কাজ করানো হত এবং তাদের থাকার জায়গায় বিছানা সবসময় গরম থাকত, কারণ দিনের শিফ্‌টের শ্রমিকরা বিছানা ছাড়ার পরই আবার রাতের শিফ্‌টের শ্রমিকরা এসে সেই বিছানায় শুয়ে পড়ত। মেশিন কেনার জন্য নিয়োজিত পুঁজি যখন শ্রমিকরা ঘুমায় সেই সময়টা অলস বসে থাকতে পারে না। মেশিনকে সর্বাধিক মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে যাতে অধিকতর মাত্রায় মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। পুঁজিপতিদের এই লোভই রাত্রিকালীন শিফ্‌ট আবিষ্কার করল। শ্রমিকরা রাতের শিফ্‌টে কাজ করছে তার অর্থই হল সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে সমগ্র শ্রমিকদের সমগ্র শ্রম সময়কে বাড়ানোর মাধ্যমে মুনাফার হারকে বাড়িয়ে নেওয়া।

সুতরাং সমানতাকে নিশ্চিত করা বা সংবিধানের ১৪, ১৫ ও ১৬ ধারা অনুসারে কাজ করার সাথে রাতের শিফ্‌টের কোন সম্পর্ক নেই। যদি সরকার সমানতা নিশ্চিত করার ব্যাপারে সত্যি সত্যিই আগ্রহী হয় তবে বেশি বেশি সংখ্যক মহিলাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ও অটোমোবাইল শিল্পে নিয়োগ করতে হবে যেখানে তুলনামূলকভাবে ভাল মজুরি ও ভাল কাজের পরিবেশ পাওয়া যায়।

বর্তমান শ্রম আইনের সুরক্ষাকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য যে পদক্ষেপ দ্রুতই আসছে এবং বর্তমান শ্রম আইনের ব্যাপক লঙ্ঘন যা চলছে তার পটভূমিতে মহিলাদের রাতের শিফ্‌ট আইনসিদ্ধ হচ্ছে। শ্রম আইনের কঠোর তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়িত করা, সাথে সাথে স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার অধিকার, শিশু পরিচর্যার ব্যবস্থা করা—এসব সুনিশ্চিত করার জন্য কঠোর পদক্ষেপ করা এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন উৎপীড়ন ও লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ—এইসব ব্যবস্থা না করে মহিলাদের জন্য রাতের শিফ্‌ট চালু করা আমাদের ফ্যাক্টরিগুলোকে সস্তা শ্রমের কারখানায় পরিণত করার দিকে আরও একটি পদক্ষেপ হবে যেখানে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো সস্তা শ্রম নিয়োগ করতে পারে যারা ''ইণ্ডিয়ায় তৈরী করবে''। (লিবারেশন, সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে)

উত্তরপ্রদেশের বালিয়ায় সামন্ততান্ত্রিক হিংসার বিরুদ্ধে লাগাতার প্রচার-প্রতিবাদে সি পি আই (এম এল)

চন্দ্রশেখর ভার্মা নামে এক কাপড় ব্যবসায়ি ১৯-২০ আগস্ট রাতে উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলার নাগরা থানার অধীন পীরাহারপুর গ্রামে সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলোর হাতে নির্মমভাবে খুন হন। পুলিশ এলে সমবেত সহস্রাধিক মানুষ পুলিশের হাতে নিহতের দেহ তুলে দিতে অস্বীকার করেন এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। এই দাবি সত্ত্বেও পুলিশ শুধু 'অজ্ঞাত' ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি এফ আই আর দায়ের করে। ঐ হত্যার পর বিজেপি সাংসদ রবীন্দ্র কুশাহাওয়া এবং স্থানীয় সমাজবাদী পার্টির বিধায়ক এবং বি এস পি নেতৃবৃন্দ পুলিশের সঙ্গে দেখা করলেও অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাননি।

সি পি আই (এম এল)-এর উদ্যোগে ২ সেপ্টেম্বর নিহতের গ্রামে একটি জনসভা সংগঠিত হয় যাতে ৫০০-রও বেশি মানুষ যোগ দেন। ঐ জনসভায় প্রশাসনের উদ্দেশে জানানো হয়, তাঁরা যদি ১৩ দিনের মধ্যে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেন তাহলে সি পি আই (এম এল) লাগাতার প্রতিবাদ কর্মসূচী সংগঠিত করবে। নিহতের স্ত্রী তারাদেবী পুলিশের কাছে এক ব্যক্তির নাম দিলেও পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন মনে করেনি। কারণ ঐ ব্যক্তির সঙ্গে শাসক সমাজবাদী পার্টির নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলেও কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে বেলথারা তহশিলে অনির্দিষ্ট কালের ধর্ণা শুরু হয়। ধর্ণায় নেতৃত্ব দেন সি পি আই (এম এল) নেতৃবৃন্দ এবং তারাদেবী সহ প্রায় ৬০০ মানুষ তাতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯ সেপ্টেম্বর সি পি আই (এম এল) জেলা সম্পাদকের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের প্রতিনিধি দল পুলিশ সুপারের সঙ্গে দেখা করে একটি দাবিপত্র জমা দিয়ে হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানান। ধর্ণার ষষ্ঠ দিনে ২০০০ মানুষ তাতে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিবাদ ক্রমেই বেড়ে চলায় অপরাধ দমন শাখার প্রধান অনিল সিং ধর্ণাস্থলে এসে প্রতিশ্রুতি দেন—১৫ দিনের মধ্যে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হবে, এই প্রতিশ্রুতির পর ধর্ণা আপাতত স্থগিত করা হয়।

বি এস পি এই ঘটনা থেকে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইলেও এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, অপরাধীদের আড়াল করার ব্যাপারে বি এস পি এবং সমাজবাদী পার্টির মধ্যে কোন ফারাক নেই। আর অভিযুক্ত ব্যক্তিটি মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত বলে বিজেপি ঘটনাটিতে সাম্প্রদায়িক রঙ চড়ানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু সফল হয়নি।

এ আই সি সি টি ইউ-র নেতৃত্বে দিল্লীতে ২ অক্টোবর সাফাই কর্মচারীদের আন্দোলন

মোদী ২ অক্টোবর 'স্বচ্ছতা অভিযান' শুরু করেন। গোটা প্রচার মাধ্যম সেদিন প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, আমলা ও গণ্যমান্যদের ঝাঁটা হাতে রাস্তা ঝাঁট দেওয়ার ছবি দেখাচ্ছিল। এ আই সি সি টি ইউ কিন্তু সেদিন দিল্লীতে এই বিষয়ে প্রচার চালাচ্ছিল যে, সাফাই কর্মীদের অধিকার সুনিশ্চিত না করে কোন 'স্বচ্ছতা অভিযান' সফল হতে পারে না। এ আই সি সি টি ইউ দীর্ঘদিন ধরেই নারেলার সত্যবাদী রাজা হরিশচন্দ্র হাসপাতালে নিয়োজিত কর্মীদের ন্যূনতম বুনিয়াদী অধিকার সুরক্ষার দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। ঐ হাসপাতালে ২২ জন ঠিকা সাফাই কর্মীকে জোরজবরদস্তি ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে এবং সাফাই কর্মীদের অধিকারের ধারাবাহিক লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে এ আই সি সি টি ইউ ২ অক্টোবর হাসপাতালে অনশন ধর্মঘট ও প্রতিবাদ সংগঠিত করে। হরিশচন্দ্র হাসপাতালে সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি দেওয়া হয় না, কর্মীদের প্রতিদিন ১২ ঘন্টা কাজ করতে হয় এবং তার জন্য কোন ওভারটাইম তারা পায় না, এমনকি গ্লাভসের মত সুরক্ষা সরঞ্জামও তাদের দেওয়া হয় না। সপ্তাহে ছুটির দিন বলে তাদের কিছু নেই এবং আইনে বাধ্যতামূলকভাবে যে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং ই এস আই সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তার থেকেও তারা বঞ্চিত। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার পর ঠিকাদার তাদের পাসবই ও চেকবই নিয়ে নিয়েছে এবং ফাঁকা চেকে জোর করে তাদের দিয়ে সই করিয়ে নেয়। ২ তারিখের অনশন ধর্মঘটে সাফাই কর্মীরা এই সমস্ত বিষয়কে তুলে ধরেন, এর সাথেই তারা অবশ্য হরিশচন্দ্র হাসপাতালের সামনে রাস্তা পরিষ্কারেও হাত লাগায়।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ অক্টোবর 'অধিকার শপথ কর্মসূচী' সংগঠিত হয় এবং সাফাই কর্মীদের অধিকার সম্পর্কে মোদী সরকারের চূড়ান্ত অবহেলাকে তুলে ধরা হয়। সেদিন মোদী সরকারের নির্দেশ মেনে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একদিকে স্বচ্ছতার অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিদের নতুন ঝাঁটা হাতে রাস্তায় নামতে দেখা যায়। অন্যদিকে, প্রায় ১০০ সাফাই কর্মী এবং অনেক ছাত্র ও কিছু শিক্ষক হাতে কালো ফিতে বেঁধে প্রতিবাদ সংগঠিত করেন। তাঁরা একটি শপথ পাঠ করেন যাতে ঠিকা শ্রমিক প্রথার অবসান এবং হাতে করে আবর্জনা পরিষ্কারের রীতির অবসানের দাবি জানানো হয়। শুধু আইন করলেই হবে না, বাস্তবে তার প্রয়োগকে সুনিশ্চিত করতে হবে বলে দাবি জানানো হয়। ঐ শপথে সাফাই কর্মীদের জন্য বেতন, বোনাস, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ইত্যাদির অধিকার দিতে হবে বলে দাবি করা হয়, যে অধিকারগুলো থেকে সাফাই কর্মীরা সারা দেশে ধারাবাহিকভাবে বঞ্চিত হয়ে চলেছেন।

সি পি আই (এম এল)
কেন্দ্রীয় মুখপত্র (মাসিক)
"লিবারেশন"
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ১৫০ টাকা

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত
হিন্দি কেন্দ্রীয় মুখপত্র (সাপ্তাহিক)
লোকযুদ্ধ
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ঃ ২০০ টাকা

পাওয়া যাচ্ছে পুস্তিকা
চারু মজুমদার এবং তাঁর উত্তরাধিকার
মূল্য ঃ ৩০ টাকা

ঘটনা ও প্রবণতা

বিজেপি সরকারের ক্রোড়পতি মন্ত্রীমণ্ডলী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মোট সম্পদের পরিমাণ ১.২৬ কোটি টাকা। টাকার অঙ্কটা কম না হলেও, মোদীর মন্ত্রীমণ্ডলীর অনেকের থেকেই সেটা বেশ কম। সবচেয়ে ধনী মন্ত্রী হলেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি—মোট সম্পদের পরিমাণ ৭২.১০ কোটি টাকা। মহিলা ও শিশু বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী মানেকা গান্ধীর সম্পদের পরিমাণ হল ৩৭.৬৮ কোটি টাকা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মোদীর ২২ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মধ্যে ১৭ জনই হলেন ক্রোড়পতি। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির সম্পদের পরিমাণ ৪.১৫ কোটি টাকা। সম্প্রতি এই তথ্য সামনে আসে মোদী সরকারের মন্ত্রীদের দেওয়া সম্পদ ও দেনার হিসাব থেকে।

— ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ৭ অক্টোবর ২০১৪

বাজারে মিলছে না অপরিহার্য অ্যালবুমিন

বাজারে মিলছে না অপরিহার্য হিউম্যান অ্যালবুমিন ইঞ্জেকশন। গুরুতর অগ্নিদগ্ধ, পথ দুর্ঘটনা, রেনাল ফেলিওর, সিরোসিস অব লিভার ইত্যাদির চিকিৎসায় অ্যালবুমিন আই ভি ইঞ্জেকশন এককথায় অপরিহার্য। কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ওষুধের দোকানদার মহলের খবর, বাজারে প্রায় দু'মাস ধরে নেই এই অপরিহার্য ইঞ্জেকশন। ফলে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়েছেন চিকিৎসকরা। রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গায় সুগারে রোগীদের জীবনদায়ী ইনসুলিন ইঞ্জেকশনের সরবরাহও অনিয়মিত। সাপের কামড়ের টীকা অ্যান্টি ভেনাম সিরাম ও ডেকামেথাসন-এর মতো গ্লুকোকর্টিকয়েড জীবনদায়ী ইঞ্জেকশনের সরবরাহ অপর্যাপ্ত। বাচ্চাদের প্যারাসিটামল ড্রপও নেই বহু জায়গায়। দু-তিনটি বড় বহুজাতিক সংস্থার থাইরক্সিন সহ বহু রোগের ওষুধও মিলছে না।

কিন্তু কেন এই সংকট? ওষুধের দোকানদার মহলের একাংশের বক্তব্য, দাম নিয়ন্ত্রণ করতে ন্যাশানাল লিস্ট ফর এসেনসিয়াল মেডিসিন-এর তালিকায় যেসব ওষুধ ও ইঞ্জেকশন অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার, সেগুলোর ক্ষেত্রে উৎপাদন কমানো, প্রচার কম করা, বাজার থেকে তুলে নেওয়া সহ নানা ফন্দিফিকির বার করেছে ওষুধ কোম্পানিগুলো। এই সংকট মূলত সেই কারণেই।

আগুনে পোড়া বা বার্ন ইনজুরিতে হিউম্যান অ্যালবুমিন এক কথায় অপরিহার্য। এই ধরনের ঘটনা ঘটলে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে তরল বেরিয়ে যায়। তার বিকল্প বা কোলয়েড হিসাবে অ্যালবুমিন। বিশেষত শিশু ও বয়স্কদের আগুনে পোড়ার চিকিৎসায় অ্যালবুমিন খুবই প্রয়োজনীয়। অপুষ্টির ক্ষেত্রে আই সি ইউ-তে ভর্তি রোগীদের সেপটিসেমিয়া হলেও বহু রোগীকে হিউম্যান অ্যালবুমিন দেওয়া হয়।

— বর্তমান, ৭ অক্টোবর ২০১৪

মানব বিকাশ সূচকে ভারত অনেক পিছিয়ে

ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউ এন ডি পি) সম্প্রতি ২০১৩-১৪ সালের মানব বিকাশ সূচক প্রকাশ করেছে। এই সূচকে ভারতের স্থান ১৩৫ নম্বরে, মোট ১৮৭টা দেশের মধ্যে। ব্রিকস (বি আর আই সি এস) ভুক্ত ৫টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান সবচেয়ে খারাপ।

মানব বিকাশ সূচকে পৃথিবীর প্রথম পাঁচটি দেশ হল— (১) নরওয়ে, (২) অস্ট্রেলিয়া, (৩) সুইজারল্যাণ্ড, (৪) নেদারল্যাণ্ড ও (৫) আমেরিকা।

ব্রিকসভুক্ত দেশগুলোর অবস্থান হল রাশিয়া-৫৭, ব্রাজিল-৭৯, চীন-৯১, সাউথ আফ্রিকা-১১৮ ও ভারত-১৩৫।

— দি টেলিগ্রাফ, ২৫ জুলাই ২০১৪

ভারতে প্রতিদিন ৪৩ জন কৃষক আত্মঘাতী হচ্ছেন

দেশে কৃষিক্ষেত্রের সংকটকে আরও একবার স্পষ্ট করে দিয়েছে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর সর্বশেষ রিপোর্ট। ধনী রাজ্য মহারাষ্ট্রে শুধু ২০১৩ সালেই আত্মহত্যা করেছেন ৩,১৪৬ জন কৃষক। গত পনেরো বছরে মহারাষ্ট্রে কৃষক আত্মহত্যার পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষের সংখ্যাই বেশী। মোট সংখ্যার প্রায় ১১.৯ শতাংশ।

ক্রমবর্ধমান উৎপাদন খরচ এবং ফসলের ন্যায়সঙ্গত দাম না পাওয়া কৃষকদের ঋণের বোঝা ক্রমাগত বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই ঋণ শোধ করতে না পারাই আত্মহত্যার মূল কারণ। কৃষক আত্মহত্যা মহামারীর চেহারা নিয়েছে পাঁচটি রাজ্যে। সেগুলো হল মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়। মোট আত্মঘাতী কৃষকের ৬২ শতাংশই ঘটে এই পাঁচটি রাজ্যে।

— বর্তমান, ১৩ অক্টোবর ২০১৪

হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচন ২০১৪

কোটিপতি প্রার্থীদের রমরমা!

১ কোটি টাকার বেশী সম্পত্তির মালিক প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী কোন্ দলে কত শতাংশ

দল	শতাংশ
কংগ্রেস	৯০
বিজেপি	৮৬
আই এন এল ডি	৮২
এইচ জে সি (বিষ্ণোই)	৫৭

অপরাধী প্রার্থী কত শতাংশ

প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীদের ৭ শতাংশ ফৌজদারি অভিযোগে, ৫ শতাংশ গুরুতর ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত।

খাপ পঞ্চায়েত প্রেম! শেম শেম!!

হরিয়ানা নির্বাচনে শক্তিশালী প্রভাব ফেলার ক্ষমতা রয়েছে ৯২টি খাপ পঞ্চায়েতের। ক্ষমতালিপ্সু কোন প্রতিদ্বন্দ্বি দলই খাপ পঞ্চায়েতকে চটাতে চায় না, বরং ব্যবহার করতে চায়। নমোজীও হরিয়ানা প্রচারে এসে খাপ পঞ্চায়েতের আশীর্বাদ নিয়েছেন।

এরা 'লাভ জেহাদী'। এদের আঁতাত কর্পোরেট পুঁজির সাথে, এদের প্রেম খাপ পঞ্চায়েতের সাথে।

— এই সময়, ১৪ অক্টোবর ২০১৪

শোক সংবাদ

ঢাকায় শেষ শ্রদ্ধা ভাষা মতিনকে

ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হল ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা আব্দুল মতিনকে। ৮৮ বছর বয়সে ৮ অক্টোবর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে প্রয়াত হন ভাষা মতিন নামে পরিচিত জনপ্রিয় এই কমিউনিস্ট নেতা। আজীবন অতি সাধারণ জীবন যাপন করা এই ভাষাসৈনিক চিকিৎসা গবেষণার জন্য নিজের দেহটিও দান করে গিয়েছেন। দান করেছেন তাঁর চোখও।

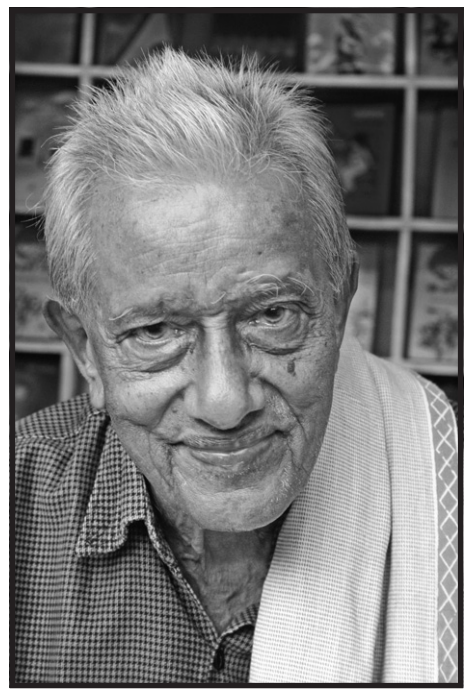

সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালিতে এক কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। ছাত্রজীবন কাটে ঢাকায়। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ যে আন্দোলন শুরু করে, ক্রমে তা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। আব্দুল মতিন ছিলেন এই সংগঠনের আহ্বায়ক। পরে জেলে গিয়ে কমিউনিস্ট মতাদর্শে আকৃষ্ট হন তিনি। বিভিন্ন সংগঠনে নেতৃত্বের পরে শেষ জীবনে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন ভাষা মতিন। ভাষা আন্দোলন নিয়ে তাঁর লেখা কয়েকটি বই প্রামাণ্য নথি হিসাবে গণ্য হয়। নিজের বর্ণময় জীবনের কথা তিনি লিখেছেন 'জীবন পথের বাঁকে বাঁকে' গ্রন্থে।

এ দিন দুপুরে তাঁর দেহ শহীদ মিনারে পৌঁছালে হাজার হাজার মানুষ জাতীয় পতাকায় ঢাকা শবাধারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তাঁকে। শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষেও। (তথ্য সংবাদ ঃ আনন্দবাজার)

পশ্চিমবঙ্গ গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কর্মচারি ইউনিয়নের বসিরহাট ২য় আঞ্চলিক সম্মেলন

মর্যাদা-ন্যায্য মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে গত ২৫ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের বসিরহাট ২য় আঞ্চলিক সম্মেলন হয়ে গেল স্থানীয় পৌরসভার দিশারী হলে। ঐদিন সকাল থেকেই নির্মাণ শ্রমিকরা বসিরহাট স্টেশন চত্বরে জমায়েত হতে শুরু করেন। সেখান থেকে ফ্ল্যাগ-ফেস্টুন-ব্যানার-ঝান্ডায় সুসজ্জিত কয়েকশ শ্রমিকের মিছিল শুরু হয়ে সম্মেলনের জায়গায় পৌঁছায়। মিছিলে সামনের সারিতে ছিলেন নির্মাণ শ্রমিক কর্মচারি ইউনিয়ন ও এ আই সি সি টি ইউ-র রাজ্য-জেলা ও আঞ্চলিক স্তরের নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনস্থলে শহীদ স্মরণে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এ আই সি সি টি ইউ রাজ্য সম্পাদক বাসুদেব বোস, জেলা সম্পাদক নবেন্দু দাশগুপ্ত, সম্মেলনের পর্যবেক্ষক তথা ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক নারায়ণ রায়, অসংগঠিত শ্রমিক নেতা আবেশ মাইতি, ইউনিয়নের আঞ্চলিক সম্পাদক দেবব্রত বিশ্বাস, নূর ইসলাম মোল্লা,সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির জেলা নেত্রী তপতী বিশ্বাস। বাবুনি মজুমদারের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের অধিবেশনের কাজ শুরু হয় প্রায় চার শতাধিক প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে।

বিদায়ী সম্পাদক দেবব্রত বিশ্বাস প্রতিনিধিদের সামনে আলোচনার জন্য খসড়া প্রতিবেদন পেশ করেন। নির্মাণ শ্রমিকরা কি অমানবিক পরিবেশে বসবাস করেন, তৃণমূল সরকার আগেকার বামফ্রন্ট সরকারের মতই যে চরম উপেক্ষা ও অবহেলার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলছে, নির্মাণ শ্রমিকরা যাতে সংগঠিত হতে না পারে তার জন্য দালাল চক্রকে মদত দিচ্ছে, শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদকে অকেজো করে রাখছে, আমলাদের আচরণ যে অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক—এসসমস্ত বিষয়গুলো প্রতিবেদনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বোপরি বলা হয়েছে, ১০ দফা দাবি সহ অধিকার আদায়ের লড়াইকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য বসিরহাট মহকুমা জুড়ে ইউনিয়নের কাজের এলাকা গড়ে তুলতে হবে।

প্রতিনিধিদের উদ্দেশে বাসুদেব বোস বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বিগত ইউপিএ সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতিগুলোকেই আরও নির্মমভাবে প্রয়োগ করে চলছে। রাজ্যের তৃণমূল সরকারের শ্রম নীতিগুলোও শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী। তিনি কেন্দ্রের ও রাজ্যের এইসমস্ত শ্রমিক বিরোধী নীতিগুলোর বিরুদ্ধে সমস্ত সংগঠিত-অসংগঠিত শ্রমিকদের নিয়ে এ আই সি সি টি ইউ-র আগামী ৪ ডিসেম্বর কলকাতা সমাবেশের কর্মসূচীকে সফল করে তোলার আহ্বান রাখেন। অন্য বক্তাদের মধ্যে নবেন্দু দাশগুপ্ত বলেন, ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন করেই অধিকার আদায় করতে হবে। সম্মেলনের পর্যবেক্ষক নারায়ণ রায় শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তপতী বিশ্বাস রাজ্য জুড়ে মহিলাপের ওপর নেমে আসা অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমস্ত শ্রমজীবী-গণতান্ত্রিক-শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে প্রতিবাদে-প্রতিরোধে দাঁড়ানোর কথা বলেন।

সবশেষে, দৈনিক ন্যূনতম ৫০০ টাকা মজুরি, ৩৫০০ টাকা মাসিক পেনশন, গৃহ নির্মাণ বাবদ ১ লক্ষ টাকা অনুদান, শ্রমিকদের বি পি এল তালিকাভুক্ত করা, শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের রাখা, দালাল চক্রকে মদত দেওয়া বন্ধ করা ইত্যাদি ১০ দফা দাবি আর মহকুমা জুড়ে কাজের এলাকা সম্প্রসারণের লক্ষ্য নিয়ে প্রতিবেদন গৃহীত হয়। ১৯ সদস্যের নতুন কার্যকরি কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে নূর ইসলাম মোল্লা ও দেবব্রত বিশ্বাস। আরও একবার বাবুনি মজুমদারের গলায় গান শোনার পর সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা হয়।

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ৩ ও ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com